

পরিবর্তন

২৬ মে ১৯৭৮



পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র

নজরুল সংখ্যা

২৬ মে ১৯৭৮ ॥ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা ৭·৫০ টাকা, ষান্মাসিক ৩·৭৫ টাকা

প্রতি সংখ্যার দাম ১৫ পয়সা

এই সংখ্যার দাম ৩০ পয়সা

শুধু মনিঅর্ডারে বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

তথ্য ও জনসংযোগ অধিকর্তা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

২৩ আর এন মুখার্জী রোড

কলিকাতা-১

পাঠকদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প খাম পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব পত্রের উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

বিষয়সূচি

প্রধান সম্পাদক

সুনীলকুমার সেনগুপ্ত আই. এ. এস.

পশ্চিমবঙ্গ

বর্ষ ১১ ॥ সংখ্যা ৪৭
২৬ মে ১৯৭৮
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫

পঞ্চায়েতী-রাজের কর্মসূচি গ্রামের মানুষের সক্রিয় সাহায্যেই রূপায়িত হোক

গ্রামের উন্নয়ন-কর্মসূচি তৈরি করা হচ্ছে স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে। আমাদের সরকার চান, এই কর্মসূচি গ্রামের মানুষের সক্রিয় সাহায্যেই রূপায়িত হোক। আমরা মনে করি, গণতন্ত্রকে শুধু বড় বড় শহর-নগরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না,—এই গণতন্ত্রকে ছড়িয়ে দিতে হবে গ্রামীণ এলাকার সুদূরতম কোণে, সব মানুষের কাছে। এই পদ্ধতি গ্রহণ করলেই মানুষের কল্যাণে গণতন্ত্রকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো যাবে।

১৭ মে ১৯৭৮ কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে আয়োজিত লক্ষাধিক জনগণের এক বিশাল সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু উপরোক্ত মন্তব্য করেন। এই প্রসঙ্গে রাজ্যে ৪ জুনের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যও শ্রীবসু জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে একটি সুস্থ নির্বাচনী-হাওয়া বইছে। ১৬ মে মহাকরণে শ্রীঅশোক মেহতা এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই নির্বাচনের অগ্রগতি ও লক্ষ্য সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন। শ্রীমেহতা হলেন কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত উচ্চক্ষমতা-সম্পন্ন পঞ্চায়েতীরাজ কমিটির চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার সার্বিক রূপান্তর ঘটাতে এবং দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা থেকে সমাজকে মুক্ত করে সামাজিক বিপ্লবের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে পঞ্চায়েতীরাজের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাম-গঞ্জের মানুষদের জন্য শুধু রাস্তা-নির্মাণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য পঞ্চায়েতকে নিয়োগ করলে চলবে না,—পঞ্চায়েতকে আরও বেশি পরিমাণ দায়িত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নতিবিধান করে গ্রামীণ অর্থনীতির আমূল রূপান্তর ঘটাতে হবে। আর এ কাজে পঞ্চায়েতের থাকবে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

এ রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে দীর্ঘ দু'-দশক পরে। গ্রাম-গঞ্জের কোটি কোটি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও মঙ্গলকর কর্মধারা দীর্ঘদিন রুদ্ধ হয়েছিল। বর্তমান সরকার সেই অচলায়তন ভেঙে গ্রামীণ উন্নতির জন্য সর্বতোমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করছেন। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি, সৃজনমূলক কর্মসংস্থান, দারিদ্র্যের অবসান করে দেশের বেশিরভাগ মানুষের সার্বিক উন্নতিই এখন সরকারের লক্ষ্য, আর তা করতে হলে পরিকল্পনা-প্রণয়ন ও তা কার্যকর করার মাধ্যম—দুই ক্ষেত্রেই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। শ্রীমেহতা জানান যে, এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মনোভাবের সঙ্গে তাঁরা একমত।



শ্রীঅশোক মেহতার নেতৃত্বে পঞ্চায়েতীরাজ কমিটি মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনারত

→

মাদ্রাসার শিক্ষা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি

রাজ্য সরকার যখন একটি মাদ্রাসা বোর্ড নতুন করে গঠন করেছেন এবং শিক্ষালয়গুলি ও শিক্ষকদের উন্নতির জন্য কয়েকটি অনুদানের কথা ঘোষণা করেছেন তখন বিভিন্ন কায়েমীস্বার্থ ও সাম্প্রদায়িক শক্তি প্রচার চালাচ্ছে যে এই সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থা তুলে দিতে চান। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই বিচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু একটি বিবৃতি দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতির পূর্ণ বয়ান এখানে দেওয়া হল ঃ

বামফ্রণ্ট সরকার এ রাজ্যে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশেষত এ রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ অতীতেও আমরা যেভাবে রক্ষা করতে পেরেছি, বর্তমানেও তা রক্ষা করতে আমরা বদ্ধপরিকর। কিন্তু বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থ ও সাম্প্রদায়িক শক্তি জনসাধাণের ঐক্যকে বিনষ্ট করার জন্য এবং এই সরকার সম্পর্কে হীন প্রচারের উদ্দেশ্যে এমন কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করছে যার সঙ্গে সত্যের কোন সম্পর্ক নেই।

সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার যে সমস্যা মাদ্রাসা-শিক্ষাও তার থেকে পৃথক নয়। সরকার এই শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ইতিমধ্যেই কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং আরও আলাপ-আলোচনা চলছে। একটি মাদ্রাসা বোর্ড নতুন করে গঠন করা হয়েছে এবং শিক্ষা বিভাগের প্রতিমন্ত্রী তার সভাপতি হয়েছেন। শিক্ষাসংস্কারও করা হচ্ছে। একজন পরীক্ষককে সরকারীভাবে নিয়োজিত করা হয়েছে। শিক্ষালয়গুলির এবং শিক্ষকদের উন্নতির জন্য সরকার বেশ কয়েকটি অনুদানের কথা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন। দুই মাদ্রাসাগুলিতে হাইস্কুলের সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে ঘাটতিভিত্তিক অনুদান দেবারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সিনিয়ার মাদ্রাসার শিক্ষকদের জন্য একটি নির্দিষ্ট বেতনক্রম চালু করবার বিষয়টিও সরকারের বিবেচনাধীন। সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে একটি সমতা আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ঠিক এই কাজগুলি যখন করা হচ্ছে তখন আমি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছি আমাদের সরকার মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা তুলে দিতে চান, এই জাতীয় একটি প্রচার করছে বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থ এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। এই প্রচার বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। এ রাজ্যের সচেতন মানুষ জানেন এই সরকার সাম্প্রদায়িক প্রীতি এবং সৌভ্রাতৃত্ব রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য সর্বদাই প্রচেষ্টা নিয়েছেন এবং কোন ধরনের সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেননি এবং ভবিষ্যতেও দেবেন না। এই রাজ্যের সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ স্বাধীনভাবে সমান সুযোগ ও অধিকার ভোগ করবেন, এটাই আমাদের নীতি। যাঁরা মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার নামে এই হীন প্রচার চালাচ্ছেন তাঁরা মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রকৃত স্বার্থরক্ষা তো করছেনই না বরং এই রাজ্যের জনসাধারণের ঐক্যকে ব্যাহত করার চেষ্টা করতে চাইছেন। পরিবেশকে কলুষিত করতেও চাইছেন। আমি সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের কাছে এই মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে সচেতন থাকার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

পঞ্চায়েতী-রাজের কর্মসূচি গ্রামের মানুষের সক্রিয় সাহায্যেই রূপায়িত হোক

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমেহতা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু সহ মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য, সরকারী কর্মচারী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলার পরে এই সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতী রাজের কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। কেন্দ্রীয় কমিটি বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও কার্যাবলীর উপর তথ্যাদি সংগ্রহ করছেন। শ্রীমেহতা ও কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ এই উদ্দেশ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসেছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীমেহতার সঙ্গে পঞ্চায়েতী-রাজ কমিটির আর যেসব সদস্য উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) সাধারণ সম্পাদক শ্রী ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য শ্রী বি শিবরামন্, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী এস কে দে ও সদস্য-সচিব শ্রী এস কে রাও।

শ্রীমেহতা আরও বলেন, গত পঁচিশ বছর পঞ্চায়েতী-রাজ সংস্থাগুলির কোন নির্বাচন হয়নি। এ সংস্থাগুলি হয় সরকার বাতিল করেছেন, নয়তো চূড়ান্ত অব্যবস্থায় ও অচলাবস্থার মধ্যে পরিচালিত হয়ে আসছে। দীর্ঘদিন পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই নির্বাচন করতে এগিয়ে এসেছেন বলে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। শ্রীমেহতা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবসু পঞ্চায়েতী-রাজের সার্থকতায় যথাসাধ্য সহযোগিতা করবেন বলে জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে এ রাজ্যের পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার একটা রূপরেখা ঠিক হয়ে যাবে বলে শ্রীমেহতা মনে করেন। রাজ্য সরকারের সক্রিয় ভূমিকায়ও তিনি আনন্দপ্রকাশ করেন। সমস্যা-কণ্টকিত পশ্চিমবঙ্গের অজস্র সমস্যার মধ্যেও এই নির্বাচন-ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার জন্য শ্রীমেহতা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবসু ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশংসা করেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে যদি কোন উত্তেজনা দেখা দিয়ে থাকে তাহলে তা অচলায়তন সমাজে গতির সূচনা বলে শ্রীঅশোক মেহতা উল্লেখ করেন।

হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ও নজরুল ইসলাম

সুধী প্রধান

"আমি সেই নজরুলকে চিনি যে-নজরুল পাশের গ্রামের বাসন্তী পুজোর সময় ভাঙা একটা পাঁচিলের উপর বসে যাত্রা গান শুনছে, যে-নজরুল লেটোর দলে বসে ঢোলক বাজাচ্ছে, যে-নজরুল সুর করে রামায়ণ পড়ছে, মহাভারত পড়ছে"—কথাগুলি লিখেছেন নজরুলের বাল্যবন্ধু প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। নজরুল পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং স্কুলের সাথীদের মধ্যে যেমন শৈলজানন্দের মত ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন—তেমনি ছিলেন শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের মত একজন ক্রিশ্চান। আমি নিজে পশ্চিমবঙ্গের একজন ব্রাহ্মণ সন্তান বলেই জানি যে সাধারণভাবে জল বা হুঁকো নিয়ে সমস্যা মুসলমানদের পক্ষে অত্যন্ত অপ্রীতিকর অবস্থায় থাকলেও বাবা-কাকাদের গ্রামস্থ মুসলমান বন্ধুদের আমরা সম্মান দিতে শিখেছিলাম। কিন্তু সে যুগে বর্ণাশ্রম ধর্মের শাসন এমনি কড়া ছিল যে ৫৫ বছর আগে স্কুলবোর্ডিং-এ থাকতে গিয়ে দেখলাম—সেখানে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর ছাত্ররা খাওয়ার সময় ভিন্ন পংক্তিতে আসন গ্রহণ করতেন। এমনি পরিবেশে কবি নজরুল ইসলাম বাঙালীর সমাজে যে তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন তা নানাদিক থেকে গবেষণার বিষয়বস্তু হবার যোগ্য বলে মনে করি।

রাঢ় ও মুসলিম সংস্কৃতির মিশ্র প্রভাব যেমন কিশোর কবির মানস গড়ে তুলতে সাহায্য করে—তেমনি আবার শিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীনিবারণ চন্দ্র ঘটক—সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী রাজনীতির দিকে কিশোর নজরুলের মনকে প্রভাবান্বিত করেন। নিবারণ বাবুর মাসিমা এককড়ি দেবী প্রথম বাঙালী মহিলা—যিনি রাজনৈতিক কারণে অস্ত্র আইনে পাঁচবছর বৃটিশ কারাগারে ছিলেন। এছাড়া সৈন্য দলে যোগদানের ফলে নজরুলের সামাজিক উদারনীতি ও স্বদেশপ্রেম—তরুণ বয়সেই তাঁকে ধর্মের গণ্ডির বাইরে থাকতে প্রেরণা দিয়েছে। আর কমরেড মুজফ্ফর আহমদের সান্নিধ্যে এসে তিনি কেবল হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথাই ভাবেন নি—সমস্ত দুনিয়ার সকল ধর্মের মেহনতি মানুষের ঐক্যের গান গেয়ে গেছেন। কালানুসারে এই বিষয়গুলির সম্যক আলোচনার স্থান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে করা সম্ভব নয়। আমি প্রথমে একটি বিষয়ে নজরুল গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—আর তা'হল বাংলা গদ্য ও পদ্যের উন্নতি সাধনে নজরুল-মুজফ্ফর জোটের অবদান।

কবি হিসাবে নজরুলের এবং সাংবাদিক ও প্রবন্ধকার হিসাবে মুজফ্ফর আহমদের বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে আগমন হ'ল প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে এবং অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের কিছু পূর্বে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে এই দুটি আন্দোলন পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে ইতিহাসে স্বীকৃত। বাংলাদেশ স্বদেশী আন্দোলনের শুরু থেকেই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে এবং ভারত বিভাগের যন্ত্রণা আজো পশ্চিমবাংলাকে সহ্য করতে হচ্ছে। তাই অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্বে নজরুল-মুজফ্ফর জোটের সাহিত্যকীর্তি এই যন্ত্রণার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিচার করলে দেখতে পাব—নতুন ধরনের বাংলা সাহিত্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে এঁরা ঐক্য-সংগ্রাম-স্বাধীনতার নীতির সূচনা করে গেছেন।

১৯১৮ সালের এপ্রিল-মে মাসে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যসমিতি দ্বারা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন মৌলভী আবদুল করিম—আর সহকারী সম্পাদক কমরেড মুজফ্ফর আহমদ। ১৯১৯ সালে এই পত্রিকাতেই নজরুল ইসলামের প্রথম কবিতা 'মুক্তি' ছাপা হয়। বাংলা ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 'সওগাত' নামে সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়—যেখানে নজরুলের কবিতা 'সমাধি' ছাপা হয়। বাংলা ১৩২৭ সালে (১৯২০) বৈশাখ মাসে 'মোসলেম ভারত' নামক আর একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয় যার লেখকবর্গের মধ্যে ছিলেন অনেক হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যিক। এই পত্রিকার প্রথম পাতায় রবীন্দ্রনাথের লেখা হতে এই অংশের উদ্ধৃতি ছিল ঃ "মানবসংসারে জ্ঞানালোকের দেওয়ালী উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটিকে বড় করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে।" এই কাগজে নজরুলের বহু কবিতা ছাপা হয় এবং তিনি খ্যাতিমান হন। ১৯২০ সালেই নজরুল ইসলাম ও মুজফ্ফর আহমদের সম্পাদনায় 'নবযুগ' নামক একটি সান্ধ্য দৈনিক প্রকাশিত হয়। একটি সুস্থ ও ঐক্যবদ্ধ জাতীয় চেতনা বিস্তারে এই পত্রিকার অবদান অসামান্য। 'মোসলেম ভারতের' রচনাগুলি পড়ে সে যুগের বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার লিখেছিলেন—"...এক নূতন ধরনের রসধারা নবজীবনের আবেগ প্রবাহে...বঙ্গসাহিত্যের অকাল প্রৌঢ়ত্ব মোচন করিয়া তাহার অঙ্গে অঙ্গে যৌবন

হিল্লোল সঞ্চারিত করিবে। নিশ্চয়ই নির্জন ও অপেক্ষাকৃত অপ্রকাশ সাধনার অবকাশে মুসলমান ভ্রাতৃগণ পূর্ব হইতেই অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, নতুবা এমন সুন্দর ভাষা ও উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভব হইত না।... নহিলে এই সাহিত্য সাধনার মধ্যে তাঁহারা যে খাঁটি বাঙালী এই প্রচ্ছন্ন সত্য কেমন করিয়া এমন প্রকট হইয়া উঠিল?"

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ১৯২১ সালের অসহযোগ ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যমূলক রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু হওয়ার আগেই ভাষা ও সংস্কৃতিতে সংগ্রাম ও ঐক্যের জোয়ার আনলেন নজরুল ও মুজফ্ফর আহমদ। নজরুলের কাব্যে যেমন বাংলাসাহিত্যে বলিষ্ঠতা ও গতি সঞ্চারিত হল তেমনি মুসলমান জনসাধারণে ব্যবহৃত অনেক কথা অনায়াসে বাংলা কাব্যে স্থান পেতে লাগল যাতে রবীন্দ্রনাথ থেকে মোহিতলাল সকলেরই ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। অপরপক্ষে মুজফ্ফর সাহেবও প্রবন্ধ ও সাংবাদিক রচনায় সারল্য ও ঋজুতার সঙ্গে জীবন সংগ্রামের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করতে থাকেন। 'নবযুগ' যেমন রাজরোষে বন্ধ হয়ে যায়—তেমনি ১৯২২ সালের আগস্ট মাসে নজরুলের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ধূমকেতু' সাপ্তাহিকও বৃটিশ শাসকদের কোপে পড়ে। এই পত্রিকাতেই নজরুল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি প্রথম তুলে ধরেন—যে দাবিতে হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের কোনও কথাই ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাই নজরুলকে 'ধূমকেতু' প্রসঙ্গে আশীর্বাদ করে লিখেছিলেন—"আয় চলে আয় রে ধূমকেতু / আঁধারে বাঁধ অগ্নি সেতু / দুর্দিনের এই দুর্গ শিরে /উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন"। কাব্য দিয়ে যে নজরুল হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের 'অগ্নি সেতু' বাঁধার চেষ্টা করছেন—একথা বুঝতে সেদিন কারো অসুবিধা হয়নি। ১৯২৫ সালে নজরুলের পরিচালনায় 'লাঙল' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় যার মারফতে সাধারণ মানুষের জীবনের সমস্যা তাদের বোধগম্য ভাষায় বোঝাবার জন্য গদ্য সৃষ্টি হতে থাকে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী এবং সকল ধর্মের উর্ধ্বে এই মানুষের মধ্যে ঐক্য গড়ার কাজে নজরুলের সাহিত্য চেষ্টা বাংলা সাহিত্যকে নতুন ঐক্যের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করে। নজরুলের প্রভাবে যুক্তিনিষ্ঠ মন নিয়ে সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্যে ১৯২৬ সালে ঢাকায় 'মুসলীম সাহিত্য সমাজ' নামে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয় যারা হজরত মুহম্মদের, পারসিক কবি সাদীর, কামাল আতাতুর্কের, রবীন্দ্রনাথের, রোমাঁ রোলাঁর বাণী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বুদ্ধির মন্ত্রে দীক্ষিত হন। এই গোষ্ঠীর পত্রিকার নাম ছিল 'শিখা'। এই ভাবে নজরুল-মুজফ্ফর জোটের সাহিত্য সাধনা—বাঙালী সমাজের বৃহত্তর অংশকে ভাষা ও বুদ্ধিচর্চার মাধ্যমে ঐক্যের পথে অগ্রসর করে। আজকের দিনের তরুণরা লক্ষ্য করবেন—বাংলা ভাষার দাবিতেই পূর্ব পাকিস্তানে নতুন জন-জাগরণ দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত 'বাংলাদেশ' গঠিত হয়। বর্তমান বাংলাদেশের মুসলিম লেখকরা যেভাবে বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করছেন তাতে সাম্প্রদায়িক ভেদ নীতি পরাস্ত হয়ে জাতিগত ঐক্যও শক্তিশালী হবে বলে ধারণা করা অনুচিত হবে না। পূর্বোক্ত 'শিখা' কাগজে নজরুল লিখেছিলেন— (মনে রাখা উচিত এইসময় সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার প্রভাব তাঁর উপর ছিল) "হায়রে ভারত হায় যৌবন তাহার / দাসত্ব করিতেছে অতীত জরার! / জরাগ্রস্ত বুদ্ধিজীবী বৃদ্ধ জরদ্গব দেখায়ে গলিত মাংস চাকুরীর মোহ / যৌবনের টিকা পরা তরুণের দলে / আনিয়াছে একেবারে ভাগাড়ে শ্মশানে / যৌবনে বাহন করি পঙ্গু জরা আজি / হইয়াছে ভারতের জনগণপতি / যে হাতে পাইত শোভা খর তরবারি / সেই তরুণের হাতে ভোট ভিক্ষাঝুলি / বাঁধিয়া দিয়াছে হায়! রাজনীতি ইহা / পলায়ে এসেছি আমি লজ্জায় দু হাতে / নয়ন ঢাকিয়া, যৌবনের এ লাঞ্ছনা / দেখিবার আগে কেন মৃত্যু হইল না"।

সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির উপর হিন্দুধর্ম ও বিবেকানন্দের প্রভাব ছিল। বিবেকানন্দ যখন চন্ডাল ভারতবাসীকে ভাই বলে গ্রহণ করতে আহ্বান দিয়েছিলেন—তখন মুসলমানের কথা উল্লেখ করেন নি। কিন্তু নজরুল এখানেও তাঁর অগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিলেন। তিনি লিখলেন: "এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বুদ্ধ! এস ক্রিশ্চান! আজ আমরা সব গন্ডি কাটাইয়া সব সংকীর্ণতা, সর্বস্বার্থ, সর্ব মিথ্যা চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না। চারিদিকে চাহিয়া দেখ পাশে তোমার ঐ বীর ভ্রাতৃগণের শব..." শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার পর নজরুল আবার বলেছেন: "আমাদের এই পতিত, চন্ডাল ছোটলোক ভাইদের বুকে করিয়া তাহাদিগকে আপন করিয়া লইতে তাহাদেরই মত দীন বসন পরিয়া তাহাদের প্রাণে তোমরাও প্রাণ সংযোগ করিয়া উচ্চশির ভারতের বুকে আসিয়া দাঁড়াও, দেখিবে বিশ্ব তোমাকে নমস্কার করিবে।" (উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন—যুগবাণী)। জাতীয় আন্দোলনের তাগিদে নজরুলকে বার বার লিখতে হয়েছে—'এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান / মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ' অথবা 'হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন' / যদিও সংস্কৃতি ব্যবসায়ীদের জন্য কালী কীর্তন থেকে ইসলামী গান রচনা তিনি করেছেন কিন্তু তার মধ্যেও শব্দ, উপমা ও বাক্ভঙ্গিতে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যগুলিকে জনপ্রিয় করতে চেষ্টা করেছেন। অবশ্য তাঁর সুস্থ চৈতন্যে ছিল ম্যাক্সিম গর্কির সেইকথা—'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান / নাহি দেশ কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি।' ঐক্যের সমস্যা তাই নজরুলকে সাম্প্রদায়িক বিভেদের গভীরে নিয়ে গিয়েছিল—এবং তিনিই প্রথম বাঙালী সাহিত্যিক যিনি একদিন দ্বিধাহীন ভাষায় বলেছিলেন:

"জাগো জনশক্তি! হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক, আমার মুটে মজুর ভাইরা! তোমার হাতের ঐ লাঙল আজ বলরাম-স্কন্ধে হলের মত ক্ষিপ্ততেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, এই অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক! আনো তোমার হাতুড়ি, ভাঙো ঐ উৎপীড়কের প্রাসাদ, ধূলায় লুটাও অর্থ-পিশাচ বলদর্পীর শির। ছোঁড়ো হাতুড়ি, চালাও লাঙল, উচ্চে তুলে ধর তোমার বুকের রক্তমাখা লালে লাল ঝান্ডা! (রুদ্রমঙ্গল)

গ্রন্থসূচি

(১) কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা—মুজফ্ফর আহমদ

(২) আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক—মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

(৩) বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ—অমলেন্দু দে

(৪) নজরুল জন্ম-জয়ন্তী—দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা

নজরুলের সাহিত্য চিন্তা

সুশীলকুমার গুপ্ত

নজরুল তাঁর 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, "বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবি', / কবি ও অকবি যাহা বল মোরে মুখ বুজে তাই সই সবি।" উক্ত কবিতার অন্যত্র তিনি জানিয়েছেন, "বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে, / দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে, / রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা / তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা, / বড় কথা বড় ভাব আসে নাক মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে! / অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে।" এসব ধরনের উক্তি থেকে মনে হতে পারে নজরুল সাময়িক উত্তেজনায় আক্রান্ত হয়ে সমকালের মনোরঞ্জনের জন্য কাব্য-সৃষ্টি করে গেছেন, সাহিত্য সম্পর্কে উচ্চকোটির ভাবনাচিন্তা করার বিশেষ অবসর তাঁর ছিল না কিংবা সাময়িকতাকে অতিক্রম করে নিত্য কালের রসলোকে পৌঁছতে তিনি আগ্রহান্বিত বোধ করেন নি। কিন্তু বিভিন্ন সাহিত্যবিষয়ক মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, নজরুল সাহিত্যের মান ও আদর্শ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। আমাদের দেশে সাহিত্যসমালোচনায় কোনো লেখককে একবার কোনো এক বা একাধিক বিশেষণে চিহ্নিত করতে পারলেই সমস্ত দায়িত্বপালন-জনিত একটা প্রবল আত্মতৃপ্তির ভাব দেখা যায়। এর ফলে যে প্রকৃত মূল্যায়নের সীমা সংক্ষিপ্ত হয়ে যায় সেকথা আমরা প্রায়ই বিস্মৃত হয়ে যাই। নজরুলের নামের সঙ্গে প্রায়শ ব্যবহৃত 'বাঁধনহারা' ও 'বিদ্রোহী' বিশেষণ দুটি সমগ্র সৃষ্টির প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটনের পথে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করেছে।

নজরুল মানসের সবচেয়ে স্থায়ী ভাব প্রেম। তাঁর ব্যক্তিসত্তার প্রেম, মানবপ্রেম, সমাজপ্রেম, দেশপ্রেম সবই তাঁর এই প্রেমানুভূতি থেকে জন্মলাভ করেছে। দেশ ও কালের নানা পরিস্থিতির জন্য এই প্রেম যথার্থভাবে প্রকাশিত হতে পারছে না বলে তাঁর বিদ্রোহ এবং তিনি সব বন্ধন থেকে সর্বদা মুক্তির প্রয়াসী। তিনি জানেন পৃথিবীতে নানা বৈষম্য, অত্যাচার, স্বার্থপরতা, অন্যায় প্রভৃতির উপস্থিতির জন্য মানুষের প্রেম প্রকৃষ্ট উপায়ে প্রস্ফুটিত হতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই এইসবের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রেম ও শান্তির জন্য নিয়োজিত প্রাণ। অন্যায়, অত্যাচার, বিশৃঙ্খলতা ও নিঃসার অতীতের বিরুদ্ধে যৌবনই সবচেয়ে সংগ্রামী ভূমিকা নিতে পারে। তাই তিনি যৌবনের নিশানবরদার। পৃথিবীর শ্রমশক্তিই মানবসমাজে প্রকৃত কল্যাণসাধন করতে পারে বলে তিনি শ্রমজীবী সমাজের আত্মার আত্মীয়। তাঁর দৃষ্টি শুধু সমকালীন কল্যাণসাধনেই আবদ্ধ নয়। তিনি পৃথিবীতে প্রেমজনিত স্থায়ী সুখ-শান্তির সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যাকুল। যতদিন পৃথিবীতে সত্যকার প্রেমের প্রতিষ্ঠা হয়ে শান্তি-সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা অর্জিত হবে না, ততদিন কবির বিদ্রোহ অম্লান থাকবে। যথার্থ প্রেম ও শান্তি স্থাপিত হলেই তাঁর বিদ্রোহী রূপ শান্ত হবে। তাঁর প্রদীপ্ত ঘোষণা,

"আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার!
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব-
সৃষ্টির মহানন্দে,

মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত!"

(বিদ্রোহী : অগ্নিবীণা)

নজরুলের এই কবিমানসের স্বরূপ তাঁর সাহিত্যচিন্তাবিষয়ক নানা রচনায় ধরা পড়েছে। নজরুল প্রেমের পূজারী। এই প্রেম তাঁর কাছে সত্য ও সুন্দর রূপে প্রতিভাত। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ মার্চ বনগাঁ সাহিত্য-সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন,

"আজ আমার মনে হয়, এই নিত্য পরমানন্দময়ী পরম প্রেমময়ী পরমা-শ্রীই আমার অস্তিত্ব—আমার শক্তি।...এই প্রেমই আমার অস্তিত্ব। এই অস্তিত্ব, এই প্রেমকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলেই যেন আমি অভিমানে সংহারের পথে চলেছিলাম। এই পরম-নিত্য প্রেম-শক্তিকে পেয়েই আমি পরম নিত্যম্—আমার eternal existence-কে পেলাম।" (নজরুল রচনাসম্ভার ঃ ঢাকা ১৯৬১ঃ পৃ ১৪১)

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে নজরুল স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন,

"ফুল ফোটানোই আমার ধর্ম। তরবারি হয়ত আমার হাতের বোঝা, কিন্তু তাই ব'লে তাকে ফেলেও দিইনি। আমি গোধূলিবেলায় রাখাল-ছেলের সাথে বাঁশী বাজাই, ফজরে মুয়াজ্জিনের সুরে সুর মিলিয়ে আজান দিই, আবার দীপ্ত মধ্যাহ্নে খর তরবার নিয়ে রণভূমে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তখন আমার খেলার বাঁশী হয়ে ওঠে যুদ্ধের বিষাণ, রণশিঙ্গা।

সুর আমার সুন্দরের জন্য, আর তরবারি সুন্দরের অবমাননা করে যে—সেই অসুরের জন্য।"

(নজরুল রচনা-সম্ভার পৃঃ ১১১)

কীটসের মতো নজরুলের কাছে সত্য ও সুন্দর ছিল এক ও অভিন্ন। সুন্দরের প্রকাশকেই তিনি সাহিত্য ও সংগীত বলে মনে করেছেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২ জুন তারিখের দৈনিক 'নবযুগে'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ('আমার সুন্দর') লিখেছেন, "আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোটগল্প হয়ে, তারপর এলেন কবিতা হয়ে। তারপর এলেন গান, সুর, ছন্দ ও ভাব হয়ে। উপন্যাস, নাটক, লেখা (গদ্য) হয়েও মাঝে মাঝে এসেছিলেন।" এই সুন্দরকে তিনি শক্তি-সুন্দর, যৌবনসুন্দর, প্রেম-সুন্দর, শোক-সুন্দর ইত্যাদি নানারূপে দেখেছেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার অ্যালবার্ট হলে বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের পক্ষ থেকে নজরুলকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অভিনন্দনের উত্তরে প্রতিভাষণে তিনি স্বীকার করেছিলেন,

"এ-কথা স্বীকার করতে আজ আমার লজ্জা নেই যে, আমি শক্তি-সুন্দর রূপ-সুন্দরকে ছাড়িয়ে আজো উঠতে পারিনি। সুন্দরের ধেয়ানী দুলাল কীট্সের মত আমারও মন্ত্র— "Beauty is truth, truth beauty."

(নজরুল রচনা-সম্ভার ঃ পৃ ৯৫)

নজরুল সুন্দরকে শুধু আনন্দিত রূপেই দেখেন নি, তিনি তাকে বেদনার্তরূপেও দেখেছেন। এই সুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ করে দেখার স্তবস্তুতিকে নিয়েই তিনি সাহিত্যরচনা করেছেন। তিনি মনে করেন সুন্দরের বেদনা থেকেই সাহিত্যসৃষ্টি হয়। তিনি তাঁর 'চক্রবাক' গ্রন্থভুক্ত 'হিংসাতুর' কবিতায় তাঁর প্রথম প্রণয়িনী নার্গিস খানমের উদ্দেশে লিখেছিলেন,

"কবির কবিতা সে শুধু খেয়াল? তুমি বুঝিবে না, রাণী,
কত জ্বাল দিলে উনুনের জলে ফোটে বুদ্বুদ-বাণী।
তুমি কি বুঝিবে, কত ক্ষত হয়ে বেণুর বুকের হাড়ে
সুর ওঠে, হায়, কত ব্যথা কাঁদে সুর-বাঁধা বীণা-তারে!"

যে বেদনা থেকে সাহিত্যের সৃষ্টি সে বেদনার মধ্যে বিশ্ববেদনার প্রতিফলন চাই। সাহিত্যিক নিজের বেদনা দিয়ে বিশ্ববেদনাকে স্পর্শ করবেন এবং তখনই বিশ্বসাহিত্য সৃষ্টি হবে ও সাহিত্যে সর্বজনীনতার পরিস্ফুটন ঘটবে। নজরুল তাঁর 'যুগবাণী' গ্রন্থভুক্ত 'বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান' প্রবন্ধে এ বিষয়ে বলেছেন,

"...সাহিত্য হইতেছে বিশ্বের, ইহা একজনের হইতে পারে না। সাহিত্যিক নিজের কথা নিজের ব্যথা দিয়া বিশ্বের কথা বলিবেন, বিশ্বের ব্যথায় ছোঁওয়া দিবেন। সাহিত্যিক যতই কেন সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা করুন না, তাহা দেখিয়াই যেন বিশ্বের যে কোন লোক বলিতে পারে, ইহা তাঁহারই অন্তরের অন্তরতম কথা; ইহা তাঁহারই বুকে গুমরিয়া মরিতেছিল, প্রকাশের পথ পাইতেছিল না। এইরূপেই বিশ্ব-সাহিত্য সৃষ্টি হয়, ইহাকে বলে সাহিত্যে সার্বজনীনতা।"

নজরুলের মতে সাহিত্যে সার্বজনীনতা সৃষ্টি করা উচিত। তবে নিজের জাতীয় ও দেশীয় বৈশিষ্ট্যকে এড়িয়ে বা হারিয়ে এই সার্বজনীনতা সৃষ্টি করা ঠিক নয়। অন্তরের কতকগুলি সত্য ও সূক্ষ্মতম ভাব আছে যেগুলি সকল দেশের লোকের পক্ষে সমান। সাহিত্যসৃষ্টির সময় সাহিত্যিককে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন। এদিকে লক্ষ্য রেখে জীবনের নিগূঢ় রহস্যকে বিশ্লেষণ করে সত্যের সৌন্দর্য ও মঙ্গলকে পরিস্ফুট করতে হবে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন,

"সত্য যদি লক্ষ্য হয়, সুন্দর ও মঙ্গলের সৃষ্টি সাধনা ব্রত হয়, তবে তাঁহার লেখা সম্মান লাভ করিবেই করিবে। অন্যের ঠিক প্রাণে গিয়া আঘাত করিবার মত শক্তি পাইতে নিজের প্রাণ থাকা চাই। এসব কথা আমরা শুধু কোন বিশেষ লেখক সম্প্রদায়কে উল্লেখ করিয়া বলিতেছি না; ইহা ঔপন্যাসিক, কবি, ছোট গল্পলেখক সকলের প্রতি প্রযোজ্য। এই তিন রকমের লেখকের মধ্যে কেহই ছোট নন, কারণ প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য—সৃষ্টি। তিনিই আর্টিষ্ট, যিনি আর্ট ফুটাইয়া তুলিতে পারেন।"

তিনি আরো লিখেছেন,

"আর্ট-এর অর্থ সত্যের প্রকাশ (execution of truth), এবং সত্য মাত্রেই সুন্দর, সত্য চিরমঙ্গলময়। আর্টকে সৃষ্টি, আনন্দ, বা মানুষ এবং প্রকৃতি (man plus nature) ইত্যাদি অনেক কিছু বলা যাইতে পারে তবে সত্যের প্রকাশই হইতেছে ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। আমাদের নবীন তরুণ আর্টিষ্ট সাহিত্যিক ও কবি-

গণ এই কয়েকটি কথা মনে রাখিয়া স্থায়ী সাহিত্যসৃষ্টির দিকে চেষ্টা ও প্রাণ প্রয়োগ করিবেন, ইহাই আমাদের বাসনা।"

'বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান' প্রবন্ধটিতে নজরুলের সাহিত্য-চিন্তবিষয়ক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য থাকাতে এটির একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে। এখানে নজরুল সত্যের প্রকাশকেই সাহিত্যসৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য বলেছেন। এই সত্য সুন্দর ও চিরমঙ্গলময়। অন্যের প্রাণকে আঘাত করার প্রাণ শক্তি সাহিত্যিকের না থাকলে সাহিত্যসৃষ্টি ব্যর্থ হয়। তিনি মনে করেন "সাহিত্যের মুক্তধারায় থাকিবে চলার আনন্দ, স্রোতের বেগ এবং ঢেউ-এর কল-গান ও চঞ্চলতা।" তিনি বলেছেন যে শরীর ও মন সুস্থ, সবল ও আনন্দিত না হলে সাহিত্যিকের পক্ষে নব নব সম্পদে-ভরা সাহিত্যসৃষ্টি করা সম্ভবপর নয়। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী সাহিত্যিকই স্বাস্থ্যোদীপ্ত ও কলমুখর সাহিত্য রচনা করতে পারেন। সাহিত্যিকের মন প্রফুল্ল রাখার জন্য তিনি অল্প-স্বল্প সংগীত আলোচনার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর ধারণা সংগীত আলোচনা করলে সাহিত্যিকের চিত্ত প্রফুল্ল থাকবে ও তাঁর লেখা এক অপূর্ব মাদকতা ও শক্তিলাভ করবে। তাছাড়া সাহিত্যকে সঙ্কীর্ণতা, ভন্ডামি ও অসত্য থেকে মুক্ত রাখতে হবে। সাহিত্যের নতুন নতুন ধারার সঙ্গে সাহিত্যিকের যোগাযোগ স্থাপন করা কর্তব্য, তাঁকে গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে গেলে চলবে না। তিনি মন্তব্য করেছেন, "...সাহিত্যিকের, কবির, লেখকের প্রাণ হইবে আকাশের মত উন্মুক্ত, উদার, তাহাতে কোন ধর্মবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, বড়-ছোট জ্ঞান থাকিবে না। বাঁধ-দেওয়া ডোবার জলের মত যদি সাহিত্যিকের জীবন পঙ্কিল, সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাঁহার সাহিত্য-সাধনা সাংঘাতিক ভাবে ব্যর্থ হইবে। তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য আঁতুড়-ঘরেই মারা যাইবে। যাঁহার প্রাণ যত উদার, যত উন্মুক্ত, তিনি তত বড় সাহিত্যিক।"

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর তারিখের 'ধূমকেতু'র পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতার জন্য নজরুলের এক বছর সশ্রম কারাদন্ড হয়। তিনি আদালতে যে জবানবন্দী দেন তা পরে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে ১৩২৯ সালের মাঘ মাসে পুস্তিকাকারে আত্মপ্রকাশ করে। তিনি এই জবানবন্দীতেও কবির বাণীরূপ কাব্য যে সত্যের প্রকাশ ঘটায় এবং সেইজন্য তা ভগবানের বাণী একথা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন। তাঁর ভাষায়,

"আমি কবি, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে-বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারে সে-বাণী ন্যায়-দ্রোহী নয়, সত্য-দ্রোহী নয়। সে-বাণী রাজদ্বারে দন্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোতে, ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ সত্যস্বরূপ।"

সত্যের মৃত্যু নেই। সুতরাং সত্যস্বরূপ কবির বাণীরও মৃত্যু ঘটতে পারে না। তাঁর মতে কোনো প্রতিকূল পরিবেশেই কবিকে সত্য থেকে বিচ্যুত হলে চলে না। কবিকে হতে হবে পরম আত্মবিশ্বাসী ও সত্যসন্ধ।

সজনীকান্ত দাস নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাকে অশালীনভাবে ব্যঙ্গ করে সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' (৪ অক্টোবর ১৯২৪)-তে 'ব্যাঙ' শীর্ষক একটি কবিতা লেখেন। নজরুল এই কবিতাটিকে মোহিতলাল মজুমদারের রচনা বলে ভুল করে 'সর্বনাশের ঘণ্টা' নামে একটি কবিতা প্রণয়ন করেন। কবিতাটি ১৩৩১ সালের কার্তিক মাসের 'কল্লোলে' প্রকাশিত হয় এবং পরে অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়ে 'সাবধানী ঘণ্টা' নামে 'ফণি-মনসা' কাব্যগ্রন্থে স্থান লাভ করে। পূর্বেই বলেছি নজরুল সাহিত্যকে সত্যের প্রকাশ বলে মনে করতেন। সত্যের সুন্দর ও মঙ্গলময় রূপকেই তিনি বরণ করেছেন। সুতরাং সাহিত্যে নোংরামি ও বাঁদরামিকে স্বাভাবিকভাবেই তিনি তীব্রভাবে আক্রমণ করতে এগিয়ে এসেছেন। 'সর্বনাশের ঘণ্টা' কবিতায় তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে,

"এত ইতরামি, বাঁদরামী-আর্ট আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে',
হন্যে কুকুর পেটপাল আর হাউ হাউ মর কেঁদে'?
এই নোংরামি ক'রে দিনরাত বল আর্টের জয়!
আর্ট মানে শুধু বাঁদরামি আর মুখ ভেঙচানো নয়।"

১৩৩৪ সালের ১৪ পৌষ তারিখের সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি'তে 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধে নজরুল তাঁকে নিয়ে নানা কদর্য বাদানুবাদ লক্ষ্য করে অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে মন্তব্য করেছিলেন, "সত্যিই আমরা সাহিত্যিকরা কুকুরের জাত। কুকুরের মতই আমরা না খেয়ে এবং কামড়াকামড়ি ক'রে মরি।" উক্ত প্রবন্ধের অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, "বিশ্বকবি সম্রাটের আসন—রবিলোক—কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির বহু ঊর্ধ্বে।" সাহিত্যে এই কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি অর্থাৎ অহেতুক পরস্পর নিন্দাবাদকে নজরুল যখনই পেরেছেন প্রবলভাবে আক্রমণ করেছেন। এই অকারণ নিন্দাবাদে সাহিত্যের প্রচন্ড ক্ষতি হয় বলে তিনি মনে করতেন। তবে তিনি এও বিশ্বাস করতেন যে সত্যকার সাহিত্যিক নিন্দাবাদের মধ্যেও সাহিত্যের অমরতাকে উপলব্ধি করেন। তাই 'বর্তমানে বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধে (বার্ষিক প্রাতিকা, ১৩৩৯) তাঁর উক্তি, "...তখনো চারপাশে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির হোলি-খেলা চলে। আমি স্বপ্নের ঘোরেই বলে উঠি— "Thou wast not born for death, immortal bird !" এই immortal bird কবি।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি নজরুল স্থায়ী সাহিত্যসৃষ্টির সপক্ষে ছিলেন এবং তাঁর বিশ্বাস ছিল যে প্রদীপ্ত যৌবনোচিত প্রাণপ্রাবল্যের সাহায্যে সমস্ত জড়তা ও সঙ্কীর্ণতা দূর করে মুক্তির সহজ আনন্দ ফোটাতে পারলেই স্থায়ী সাহিত্য রচনা সম্ভব।

নজরুলের ধারণায় কবির দায়িত্ব সত্যকার কাব্যসৃষ্টির। বাঁধা নিয়মের বল্গা কষে আর্টের উচ্চৈঃশ্রবা গতি পদে পদে ব্যাহত ও আহত করলে আর্টের যথার্থ উদ্দেশ্য ক্ষুণ্ন হয়। এই সূত্রে তিনি

ক্ল্যাসিকতার সমর্থকদের কটাক্ষ করেছেন। প্রাচীনপন্থী আর্টশালা-রক্ষী সমালোকদের "প্রাণহীন আনন্দগুণ্ডা" বলতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। তিনি বলেছেন বেদনাকে আশ্রয় করে নবীনপন্থীদের নবসাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে এবং এই সাহিত্যই হবে স্থায়ী সাহিত্য।

নজরুল মনে করতেন সাহিত্যে ছোট বড় সকলেরই প্রয়োজন আছে এবং সাহিত্যের সকল বিভাগই সমান মূল্যবান। কাব্যের সঙ্গে নাটক ও কথাসাহিত্যের তুলনা করে তিনি ইব্রাহিম খানকে একটি পত্রে (সওগাত, পৌষ ১৩৩৪) লিখেছিলেন, "আপনিও 'কামাল পাশা' না লিখে এই হতভাগ্য মুসলমানদের জীবন নিয়ে নাটক লিখতে আরম্ভ করুন না।...কামাল পাশা'র দরকার আছে জানি, কিন্তু তার চেয়েও দরকার—আমাদের চোখের সামনে আমাদেরই জীবনের এই ট্র্যাজেডি তুলে ধরা।...আমাদের সবচেয়ে বড় অভাব কথা-সাহিত্যিকের। এর তো কোনো আশা-ভরসাও দেখছি নে কারুর মধ্যে। অথচ কথা-সাহিত্য ছাড়া শুধু কাব্যের মধ্যে আমাদের জীবন, আমাদের আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে কেউ পারবেন না।" এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে 'কামাল পাশা' নজরুলের 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থভুক্ত একটি বিখ্যাত কবিতা।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত একটি পত্রের এক জায়গায় নজরুল লিখেছিলেন, "কবি এবং মৌ-মক্ষী! বিশ্বের মধু আহরণ ক'রে মধু-চক্র রচনা করে গেল এরাই।" (নজরুল রচনা-সম্ভার ঃ পৃ ১৮৮)। তাঁর মতে সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার পরিচয় বিধৃত থাকে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ ও ৬ এপ্রিল কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির রজত-জুবিলী উৎসবে সভাপতির ভাষণের এক জায়গায় নজরুল বলেছিলেন, "সাহিত্য ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। আমি সাহিত্যে কি করেছি, তার পরিচয় আমার ব্যক্তিত্বের ভিতর। পদ্ম যেমন সূর্যের ধ্যান করে, তার জন্য তার দল মেলে, আমিও আমার ধ্যানের প্রিয়তমের দিকে চেয়েই গড়ে উঠেছি। আমি কোনো বাধা-বন্ধন স্বীকার করিনি, বিস্মৃত দিনের স্মৃতি আমার পথ ভুলায় নি, আমি আমার বেগে পথ কেটে চলেছি।" (ঐ ঃ পৃ ১৪৬)। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ১১ অগস্ট তারিখে বেগম শামসুন্ নাহার মাহমুদকে লিখিত পত্রের এক জায়গায় তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টাকে যে দেখেছে সে-ই বড় দেখা দেখেছে। এই দেখা আর্টিস্টের দেখা, ধেয়ানীর দেখা, তপস্বীর দেখা।" (নজরুল রচনা-সম্ভার পৃঃ ১৬৩)। কবিতার মধ্যেই কবির প্রকৃত জীবনী প্রকাশিত হয়। উক্ত চিঠির অন্য এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "আমার জীবনের যে বেদনা, যে রং, তা আমার লেখায় পাবে। অবশ্য, লেখার ঘটনাগুলো আমার জীবনের নয়, লেখার রহস্যটুকু আমার, ওর বেদনাটুকু আমার। ঐখানেই তো আমার সত্যিকার জীবনী লেখা রয়ে গেল।" (ঐ ঃ পৃ ১৬৪)।

নজরুলের ধারণায় কবিকে তাঁর কাব্যসৃষ্টির কষ্টিপাথরে ঘষে তাঁর গুণাগুণ বিচার করা উচিত। তাঁকে তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মাধর্মের মানদণ্ডে বিচার করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ১৩৩২ সালের ২৩ অগ্রহায়ণ তারিখে আনওয়ার হোসেনকে লিখিত পত্রের এক জায়গায় তাঁর উক্তি, "মুসলমান সমাজ কেবলই ভুল করেছে—আমার কবিতার সঙ্গে আমার ব্যক্তিত্বকে অর্থাৎ নজরুল ইসলামকে জড়িয়ে। আমি মুসলমান—কিন্তু আমার কবিতা সকল দেশের, সকল কালের এবং সকল জাতির। কবিকে হিন্দু-কবি, মুসলমান-কবি ইত্যাদি বলে বিচার করতে গিয়েই এত ভুলের সৃষ্টি!

আমি আপাতত শুধু এইটুকুই বলে রাখি যে, আমি শরিয়তের বাণী বলিনি—আমি কবিতা লিখেছি। ধর্মের বা শাস্ত্রের মাপকাঠি দিয়ে কবিতাকে মাপতে গেলে ভীষণ হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। ধর্মের কড়াকড়ির মধ্যে কবি বা কবিতা বাঁচেও না, জন্মলাভ করতে পারেন না। তার প্রমাণ—আরব দেশ। ইসলাম ধর্মের কড়াকড়ির পর থেকে আর সেথা কবি জন্মাল না।" (ঐ ঃ পৃ ১৫২)।

উপরের মন্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে নজরুল কখনও চান নি যে কবিতা কোনো সংকীর্ণ ধর্মমতবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং তার মধ্যে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য প্রকট হয়ে উঠবে। তাঁর ভাষায়, "আমার বিশ্বাস, কাব্যকে ছাপিয়ে উদ্দেশ্য বড় হয়ে উঠলে কাব্যের হানি হয়।" (ইব্রাহিম খানকে লেখা পত্র। নওরোজ, ভাদ্র ১৩৩৪)। কবিতা দেশ কাল জাতি নির্বিশেষে সকলের আনন্দের সামগ্রী। সাময়িক গণ্ডির মধ্যে কবিতাকে বাঁধতে গেলে তার পক্ষে স্থায়িত্ব লাভ করা অসম্ভব। তিনি সাহিত্য সম্পর্কে এক অভ্রান্ত সময় চেতনা ও ইতিহাসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এক উজ্জ্বল সময়চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি লিখেছেন, "বাঙলা সাহিত্যে আমার স্থান সম্বন্ধে আমি কোনোদিন চিন্তা করি নি। এর জন্য লোভ নেই আমার। সময়ই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সমালোচক। যদি উপযুক্ত হই, একটা ছালা-টালা পাব হয়ত।" (আনওয়ার হোসেনকে লিখিত পত্র। নজরুল রচনা-সম্ভার ঃ পৃ ১৫৬)। পূর্বালোচিত 'বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান' (যুগবাণী) প্রবন্ধে স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টির উপায় এবং স্থায়ী সাহিত্যস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "এখন আমাদের বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে সর্বপ্রথম আমাদের লেখার জড়তা দূর করিয়া তাহাতে ঝর্ণার মত ঢেউভরা চপলতা ও সহজ মুক্তি আনিতে হইবে। যে সাহিত্য জড়, যার প্রাণ নাই, সে নির্জীব সাহিত্য দিয়া আমাদের কোন উপকার হইবে না, আর তাহা স্থায়ী সাহিত্যও হইতে পারে না। বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া খুব কম লেখকেরই লেখায় মুক্তির জন্য উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ফুটিতে দেখা যায়।"

নজরুলের মতে তারুণ্য বা যৌবনই সমস্ত দারিদ্র্য ও বেদনা সহ্য করে প্রকৃত প্রাণবন্ত ও অভিনব সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে। তরুণদের বিষয়ে ইব্রাহিম খানকে একটি পত্র তিনি লিখেছিলেন, "দারিদ্র সইবার মত পিঠ যদি কারুর থাকে, তা তরুণদেরই আছে। এরাই সৃষ্টি করবে

(শেষাংশ ১০৭৩ পৃষ্ঠায়)



তিনি পারেন গাইতে প্রেমের গান
দারুণ অপ্রেমের আগুনে
যখন তিন-ভুবনে আনে চোখের ধাঁধা যখন মানুষ
নিজের বুকে ছুরি বসায়, দিনদুপুরে ভাইকে করে খুন;

তিনি পারেন রক্তেভাসা মাটিকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে
অবাক করতে ভালবাসা—
'জীবন, আহা জীবন, আহা মানব জীবন, আবাদ করলে হয় সে
সোনা !'—

সব যদি যায়, তবুও তাঁর মুখের ভাষা
হয় না মলিন। বরং সর্বনাশেই তিনি হাতের কলম বুকের রক্ত
এক ক'রে নেন; সর্বনাশেই স্বপ্ন দেখেন, রাস্তা হাঁটেন,
যমদুয়ারের কড়া নাড়েন—

তিনি পারেন মানুষ ও পৃথিবীর জন্য, প্রেমের জন্য জীবন দিতে;
যুদ্ধ হেরে যুদ্ধ জিততে; তিন ভুবনের পশুর স্পর্ধা, ইতর স্বার্থ,
হিংসা ও লোভ
গানের হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে। তিনি পারেন।

তিনিই পারেন ॥

২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫

ভারতীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও নজরুল

নারায়ণ চৌধুরী

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিসত্তার দুটি ভাগ। এক ভাগে তিনি ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এক প্রবল সমর্থক, অন্য ভাগে তিনি আন্তর্জাতিক মৈত্রী সৌভ্রাত্র ও সংহতির এক শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা। নজরুলের ব্যক্তিত্বে এই দুই আদর্শের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা যায় না, তার কারণ তাঁর জাতীয়তার ধারণা সংকীর্ণ মনোভাবের দ্বারা সংকুচিত নয়, পরন্তু আন্তর্জাতিক আদর্শে পৌঁছুবার এক আবশ্যিক প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। বিশ্বকে ভালবাসবার পূর্বশর্ত হিসাবে আগে স্বদেশকে ভালবাসা চাই, নয়তো বিশ্বপ্রেম প্রায়শ একটা শূন্য-গর্ভ অসার আস্ফালন হয়ে দাঁড়ায়। স্বদেশের পরাধীনতার জন্য বেদনাবোধ নেই, তার স্বাধীনতার জন্য দুর্বার আকাঙ্ক্ষা নেই, এদিকে বিশ্বমৈত্রীর জন্য কেঁদে ভাসিয়ে দিতে চাওয়া—এর ফাঁকি ও মেকি লোকের চোখে না পড়েই পারে না।

সুখের বিষয় নজরুলের জীবনে এমনতর ফাঁক ও স্ববিরোধের অবকাশ ছিল না। তাঁর স্বদেশপ্রেম ছিল খাঁটি স্বদেশপ্রেম—দেশকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসতেন, তা বলে নিজের দেশের যা-কিছু সবই ভাল আর বিশ্বমহীতলে বাদবাকি সব কিছুই মন্দ এমনতর অনুচিত শ্রেষ্ঠত্বাভিমানে ও চিত্তকার্পণ্য তাঁর ছিল না। ফলে দেশকে ভালবেসেই একই সঙ্গে বিশ্বকে ভালবাসাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। জাতীয়তা বা স্বদেশাত্মিকা বুদ্ধির মধ্যে উগ্র জাত্যভিমান, পরবিদ্বেষ তথা জঙ্গীবাদী মনোভাব নিহিত থাকলে তা ক্ষতিকর এবং পরিণামে নিজ দেশেরই বিকাশের বাধক হয়ে ওঠে। কিন্তু নজরুলের স্বদেশপ্রেম সে জাতের স্বদেশ-প্রেম ছিল না। তা ছিল মুক্ত উদার, ভৌগোলিক গণ্ডীবদ্ধতার কৃত্রিমতা বর্জিত। ফলে তাঁর পক্ষে দেশবাসীর স্বাধীনতার দাবি জোরালো কণ্ঠে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববাসীর মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত ছিল না। বস্তুত এই দুই দাবি তিনি প্রায় একই কালে উচ্চারণ করেছেন তাঁর কাব্যে ও সাহিত্যে, আর, আরও যেটা আশ্চর্যের, সাহিত্য জীবনের একেবারে প্রারম্ভভাগ থেকেই জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা তাঁর চিন্তায় ও কল্পনায় যুক্তবেণীর মত অচ্ছেদ্য হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

এ জাতিপ্রেম থেকে বিশ্বপ্রেমে উত্তরণ নয়, বা বিবর্তনের নানা ধাপ বেয়ে দেশের গণ্ডি অতিক্রম করে জগৎসভায় গিয়ে পৌঁছুনো নয়— এ প্রায়-সহাবস্থান। যে কালে নজরুল ধূমকেতু পত্রিকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য গভীর আকুলতাপূর্ণ 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামক জ্বালাময়ী কবিতাটি লিখে রাজদ্রোহের অভিযোগে কারা-বরণ করেছেন, প্রায় তার একই সময়ে বা কিছু পরে তিনি একাধিক কবিতায় রুশ বিপ্লবকে স্বাগত জানাচ্ছেন এবং বিশ্বজোড়া সর্বহারা নিপীড়িত শ্রেণীর সংহতির জয়ধ্বনি করে 'অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত' রচনা করছেন। কিংবা, ধূমকেতু প্রকাশেরও আগেকার পর্বে সান্ধ্য 'নবযুগ' পত্রিকায় কাজী নজরুল কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সহযোগিতায় ভারতের অভ্যন্তরে সংঘটিত জাতীয় ঘটনাবলীর সংবাদের পাশে পাশে বিশ্ববার্তাকেও একটা বড় স্থান ছেড়ে দিচ্ছেন। "পরদেশ পঞ্জী" এবং "মুসলিম জাহান" এই দুই নামে বিশ্ববার্তাগুলি প্রকাশিত হত। সুতরাং নজরুলের ভাবনায় জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার স্ফুরণ, বলা যেতে পারে প্রায় সমকালেরই ঘটনা আর এই ঘটনা সাহিত্য-জীবনের একেবারে সূত্রপাতেই সংঘটিত।

দেশের স্বাধীনতার জন্য অদম্য কামনা নজরুলের কবিতায়, গানে, গদ্যরচনায় সর্বত্র একটা তীব্র ভাবাবেগ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। নজরুলের রচনায় এই হৃদয়ধর্মের আধিক্যের মূলে আছে তাঁর সহজাত মানবদরদ, বিশেষত সমাজের অত্যাচারিত অবিচারিত অনাদৃত শ্রেণীর মানুষের জন্য অপরিমেয় সহানুভূতি। নজরুল 'বিদ্রোহী' কবি আখ্যায় আখ্যাত হয়েছেন—সে কিছু আকস্মিক বা আপাতিক অভিধার আরোপ নয়, কবির দুর্নিবার ভাবাবেগের ঐশ্বর্যের মধ্যেই ওই তাৎপর্যপূর্ণ অভিধার মূল খুঁজে পাওয়া যাবে। এই প্রকার ভাবাবেগের ঐশ্বর্য বা প্রাচুর্য কাব্যশৈলীর চরমোৎকর্ষের ব্যাঘাতক হয় কিনা ঠিক বলতে পারব না, তবে তা যে আন্তরিকতার এক শ্রেষ্ঠ উৎস সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। যে-কবির অন্তরে নিগৃহীত শোষিত স্তরের মানুষদের জন্য এত বেদনার কারুণ্য ও দুঃখের আর্তি, তাঁর পক্ষে কি পরিশীলিত বুদ্ধিজীবী কবির ধরনে আঙ্গিকের বিশুদ্ধি আর বাগ্‌ভঙ্গির পরিমিতি ও পারিপাট্য রক্ষা করে নিকষ কবিতা লেখা সম্ভব। ওই মার্জিতশৈলী সুকর্ষিত-ছন্দ কিন্তু কার্যত হৃদয়তাপে দীন কবিতা রচনার সংস্কার ও অভ্যাস আর যাকেই মানাক, নজরুলকে মোটেই মানায় না। নজরুলের

কবি-মানসিকতায় ভাবাবেগের অজস্রতা যদি তাঁর রচনার দুর্বলতার দিক হয়, একই সঙ্গে সেটা তাঁর শ্রেষ্ঠ শক্তিরও এক নিশানা। লক্ষ্য করবার বিষয়, নজরুল যখন স্বাধীনতার আকুলতায় ভরপুর করে স্বদেশ ভাবোদ্দীপক কবিতা লেখেন, একই সময়ে তিনি দেশের অগণিত পীড়িত আর্ত সর্বহারা মানুষের মুক্তির কথাও বলেন। তাঁর কল্পনায় জাতীয় মুক্তি আর নির্যাতিত সাধারণ মানুষের মুক্তি সমার্থক। দেশের সুবিধা-ভোগী শ্রেণীর মানুষগুলির আরও বেশী সুবিধাপ্রাপ্তির সুযোগের জন্য তিনি স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি স্বাধীনতা চান দেশের গণনাহীন সাধারণ দুঃখী মানুষের জীবনে মুক্তির স্বাদ বইয়ে দেবার জন্য, তাদের সীমাহীন দারিদ্র্যের দুর্গতি ঘুচে গিয়ে যাতে তাদের জীবনে সাচ্ছল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য আসে সমাজে তার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য। পেটমোটা মানুষের পেট আরও স্ফীত করবার জন্য যে-স্বাধীনতা, তেমন স্বাধীনতার জন্য নজরুলের মনে কোন মোহ নেই। তাঁর চাওয়া স্বাধীনতার মানেই হল মেহনতী মানুষের স্বাধীনতা, শ্রমজীবী কৃষক-মজদুরের স্বাধীনতা। সমাজের একেবারে সবশেষের পৈঠায় যারা বাস করে সেই অগণিত নিরুপাধিক নিরুপায় নিঃস্ব মনুষের স্বাধীনতাও, বলাই বাহুল্য, তাঁর এই স্বাধীনতার বলয়ের অন্তর্গত। কাজেই নজরুলের জাতীয়তাকে বুর্জোয়া ন্যাশা-ন্যালিস্টের জাতীয়তার সঙ্গে কোনমতেই এক করে দেখা চলে না। এ দুয়ের জাতই আলাদা।

ভাবাবেগের ঐশ্বর্য

নজরুলের প্রতিটি কবিতায় যেন ভাবাবেগ টগবগ করে ফুটছে এবং আগ্নেয়গিরির অগ্নি-উচ্ছ্বাসের মত লেখনীমুখে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সুতীব্র রোষ ও ধিক্কার-ধ্বনির গলিত লাভাস্রোত উদ্গিরণ করছে। যে "আনন্দময়ীর আগমনে" কবিতার জন্য কবির এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয় (১৯২৩) তার প্রথম কয় পংক্তি এরূপঃ

"আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল;
দেব-শিশুদের মারছে চাবুক বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসী,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা আসবি কখন সর্বনাশী?
দেব-সেনা আজ টানছে ঘানি তেপান্তরের দ্বীপান্তরে
রণাঙ্গনে নাববে কে আর তুই না এলে কৃপাণ ধরে?

পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় অন্তরের ফুটন্ত জ্বালামুখ থেকে যে অনলস্রাবী আবাহনীর উৎসার তার উদ্দিষ্ট কে বা কারা? সেই সঙ্গে স্বদেশবাসীদের মধ্যে যারা পরপীড়ক লুণ্ঠক ও বঞ্চক সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দিয়ে এদেশে অবাঞ্ছিত বিদেশী শাসন আরও বেশী কায়েম করতে সাহায্য করছে, শুধু তাই নয়, ইংরেজের নিকট নানাবিধ গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়ে দেশের স্বার্থের প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তাদের তিনি একহাত নিয়েছেন এই কবিতায় এবং তাদের সম্পর্কে চরম ঘৃণা প্রকাশ করেছেন—

"উৎপীড়কে প্রণাম করে শেষে ভগবানে নমি,
হিজরে ভীরুর ধর্মকথায় ভণ্ডামীতে আসছে বমি।
টিকটিকির ঐ ল্যাজুড় সম দিকবিদিকে উড়ছে টিকি,
দেব্‌তার আগে পুজে দানব, তাদের কাছে সত্য শিখি।
পুরুষ ছেলে দেশের নামে চুগ্‌লি খেয়ে ভরায় উদর
টিকটিকি হয়; বিষ্ঠা কি নেই—ছি ছি এদের খাদ্য ক্ষুধোর!
আজ দানবের রঙমহলে তেত্রিশ কোটি খোজা গোলাম
লাথি খায় আর চেঁচায় শুধু—'দোহাই' হুজুর মলাম মলাম।"

কবিকে যখন হুগলি জেলে বন্দী করে রাখা হয় তখন বাংলার জেলগুলির অবস্থা ছিল অতীব দুঃসহ। রাজবন্দীদের প্রতি জেল-কর্তৃপক্ষের আচরণ কী হওয়া উচিত বা অনুচিত তার নিয়মগুলি জেল-কোডে বিধিবন্ধ থাকলেও কার্যত সেগুলিকে মান্য করবার কোন গরজই দেখা যেত না জেলের কর্তাদের। কিতাবেই শুধু সেগুলি লেখা থাকত, বস্তুত অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। জেলের অসহনীয় অবস্থা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতি-বাদ জানিয়ে কবি দীর্ঘদিন অনশন করেছিলেন সে কথা সর্বজন-বিদিত। অনশনে মৃত্যু ঘটলেও, তার থেকে তিনি প্রতিনিবৃত্ত হবেন না এমনি ছিল তাঁর সংকল্পের অনমনীয়তা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অনশন থেকে নিবৃত্ত হবার জন্য 'তার'যোগে অনুরোধ করেন, এক রহস্যময় কারণে জেল-কর্তৃপক্ষ সে-টেলিগ্রাম কবির কাছে পৌঁছে দেন না। বিদেশী শাসক শক্তির স্বেচ্ছাচারী মনোভাব ও বিচিত্র খেয়ালের এ এক মোক্ষম দৃষ্টান্ত। অবশেষে মাতৃকল্পা শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবীর হস্তক্ষেপে ও নির্বন্ধা-তিশয্যে নজরুল অনশন ভঙ্গ করেন।

ইংরেজের কারাগার সম্পর্কে কবির প্রকৃত মনোভাব কী ছিল তা নিচের গানটিতে মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে—

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল পুজার পাষাণ বেদী,
ওরে ও তরুণ ঈশান,
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ,
ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচীন প্রাচীর ভেদি।"

এ গানটা অবশ্য জেলে বসে লেখা নয়। আগের অধ্যায়ের রচনা। এটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'বাঙ্গালার কথা' পত্রিকায় ২০ জানুয়ারি ১৯২২ সংখ্যায় "ভাঙার গান" নামে ছাপা হয়েছিল। ভ ঙার গান ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল।

জেলে বরিশালের প্রসিদ্ধ নির্যাতিত দেশনায়ক সতীন সেন এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট রাজবন্দীকে যখন হাতে হাতকড়া ও পায়ে বেড়ী পরিয়ে সেলে অবরুদ্ধ করে অন্যান্য বন্দীদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার আয়োজন করা হল, তখন নজরুল তাঁর বিখ্যাত "শিকল-পরার গান"টি গেয়ে ওই অবস্থার প্রতিবাদ জানালেন। নজরুলের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সাথী ও সুহৃৎ শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত বিবরণ ('কাজী নজরুল ইসলাম পৃঃ ৫৫') থেকে দেখা যায়, কবি এই সময়ে সেলের লোহার গরাদের উপরে স্বীয় হাতকড়া বাঁধা হাত দুটির ঘা দিয়ে দিয়ে প্রয়োজনীয় লয়ের সৃষ্টি করে গাইতেন—

"(এই) শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল
(এই) শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল!
(তোমার) বন্দীকারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
(ওরে) ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়!
(এই) বাঁধন পরেই বাঁধন ভয়কে করব মোরা জয়,
(এই) শিকল বাঁধা পা নয় এ শিকল ভাঙা কল।"

ঠিক অনুরূপ ভাবের প্রতিধ্বনি মেলে তাঁর "সেবক" নামক প্রসিদ্ধ কবিতাটিতেও। জেলে থাকা কালে এই কবিতাটির আবৃত্তি দ্বারা কবি তাঁর সহবন্দীদের সংগ্রামশক্তি বাড়িয়ে তুলেছিলেন।

"সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,
নাই কিরে কেউ সত্য-সেবক বুক খুলে আজ দাঁড়ায়?
শিকলগুলো বিকল করে পায়ের তলায় মাড়ায়,
বজ্রহাতে জিন্দানের এই ভিত্তিটাকে নাড়ায়?"

"জিন্দান" মানে জেলখানা। শিকলকে বিকল করার ধ্বনিসাদৃশ্যযুক্ত বাক্ প্রতিমাটি নজরুলের গানে বারে বারে ফিরে এসেছে।

নজরুলের আর একটি প্রসিদ্ধ রচনা হল "বন্দীবন্দনা" নামক গানটি। কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদের মতে এই গানটি কবি রচনা করেছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের কালে, কুমিল্লায় বসে। ('কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা', পৃঃ ৮১)। গানের প্রথম কয়েক চরণ এইরকমঃ

"আজি রক্ত-নিশি-ভোরে
এ কি এ শুনি ওরে
মুক্তি-কোলাহল বন্দি-শৃঙ্খলে,
ঐ কাহারা কারাবাসে
মুক্তি হাসি হাসে
টুটেছে ভয়-বাধা স্বাধীন হিয়া তলে"

মরণ-জয়ের প্রেরণা

নজরুলের প্রায় প্রত্যেকটি স্বদেশী গানেই মরণ-জয়ের উজ্জীবক প্রেরণার ভাবটি নিহিত আছে। উপরের গানটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

"ওরা দুপায়ে দলে গেল মরণ শঙ্কারে
সবারে ডেকে গেল শিকল-ঝঙ্কারে
বাজিল নভ-তলে স্বাধীন ডঙ্কারে,
বিজয়ী-সঙ্গীত বন্দী গেয়ে চলে,
বন্দীশালা মাঝে ঝঞ্চা পশেছে রে উতল কলরোলে।"

মরণ জয়ের ভাবটি বিখ্যাত 'মরণ-বরণ' গানটিরও মূল উপজীব্যঃ

"এস এস এস ওগো মরণ!
এই মরণ-ভীত মানুষ মেষের ভয় করগো হরণ॥
না বেরিয়েই পথে যারা পথের ভয়ে ঘরে
বন্ধ করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে,
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাদের বুকের পরে
ভীমরুদ্রতালে নাচুক তোমার ভাঙ্গন ভরা চরণ।"

এই গানটিও অসহযোগ আন্দোলনের কালে রচিত। এর পরের আর একটি প্রসিদ্ধ গান হল "পাগল পথিক"। এটি গান্ধীজীকে উদ্দেশ্য করে রচিত। গান্ধীজীর অহিংসাতত্ত্বের প্রতি যদিও নজরুলের তেমন আস্থা ছিল না, তাহলেও ১৯২০-২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে জন-জাগরণের এক প্রচণ্ড বিগ্রহ রূপে গান্ধীজীর ভাবমূর্তি তাঁর কবি-কল্পনাকে বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করেছিল। তারই ফলশ্রুতি এই গান।

"এ কোন্ পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মা'র আঙিনায়।
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ-হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায়।
অধীন দেশের বাঁধন-বেদন
কে এলো রে করতে ছেদন?
শিকল দেবীর বেদীর বুকে মুক্তি-শঙ্খ কে বাজায়॥"

কবির এ সমস্ত গান তাঁর 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যাবে।

কিন্তু নজরুলের জাতীয় ভাবোদ্দীপক সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গান হল "দুর্গম গিরি কান্তার মরু" নামক কোরাসটি। কি বাণীর গাম্ভীর্যে কি সুরের সমৃদ্ধিতে এ গানটির কোন তুলনা হয় না। এটি ১৯২৬ সালের ২২ মে তারিখে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত দুইদিন-ব্যাপী বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের উদ্বোধন-সঙ্গীত রূপে গীত হয়েছিল। রচনাও ওই সময়ের।

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আজ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার॥"

গানের একটি অংশে আছে—

"অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ!
'হিন্দু না ওরা মুস্লিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।"

এই গানে হিন্দু-মুসলমানের বিশেষ উল্লেখের কারণ এই যে, ওই সময় কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বেধেছিল এবং কয়েক দিন বাদে বাদে তিন দফায় আত্মপ্রকাশ করে বেশ কিছু ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর আজন্ম সাধক নজরুল এই দাঙ্গার ঘটনায় খুবই বিচলিত বোধ করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের হানাহানি তাঁর প্রাণে গভীর দাগ দেয়। সেই বেদনা-বোধেরই অভিব্যক্তি পাই উপরের কটি চরণে। নজরুলের জাতীয়তা সকল সম্প্রদায়ের মিলিত জাতীয়তা—এর মধ্যে দ্বিজাতি-তত্ত্ব বা বহুজাতি-তত্ত্বের কোন স্থান নেই। হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়কে দুটি আলাদা 'নেশন' রূপে চিহ্নিত করে তাদের একজাতীয়তার মূলে ঘা দেওয়ার যে চেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে এ দেশে চলে আসছে এবং এখনও যার বিরাম হয়নি নজরুলের অসাম্প্রদায়িক আদর্শ ছিল তার মূর্তিমন্ত প্রতিবাদ স্বরূপ। তাঁর চোখে হিন্দু মুসলমান ছিল "এক বৃন্তে দুটি

(শেষাংশ ১০৬৮ পৃষ্ঠায়)

ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

সংগীত-প্রতিভা নজরুল

কাব্য-জগতে নজরুলের আবির্ভাবের মতো সংগীত-জগতেও নজরুলের আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ঐতিহাসিক ঘটনা। শিল্পকলা চিরকালই সৃষ্টিশীল। ভারতীয় সংগীতকলাও তাই সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে বিচিত্ররূপে বিভিন্ন ধারায় বিকাশ লাভ করেছে। ভারতীয় সংগীতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রতিভাধর শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা তাঁদের অমিত প্রতিভার জাদু-স্পর্শে নানা বর্ণে নানা সজ্জায় সংগীত-সরস্বতীকে বিভূষিতা করেছেন। বাঙলার সংগীত ইতিহাসেও তাই যুগে যুগে সৃজনশীল সংগীত-প্রতিভার উদ্ভব হয়েছে। বাঙলার সংগীত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে চিরকালই উজ্জ্বল। সঙ্গীতঅন্তপ্রাণ বাঙালী হিন্দুস্থানী সংগীতের পরিপোষক হয়েও গতানুগতিকতার স্বর-কল্লোলে কখনও তা ভাসিয়ে দেয়নি। এই পটভূমিতেই আমরা সুরস্রষ্টা দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, কান্তকবি রজনীকান্ত ও নজরুল ইসলামকে পাই। সুরকার-কবি এই প্রতিভাপঞ্চক বাঙলার সংগীত-মালঞ্চকে যে কী বিপুলরূপে শ্রীমণ্ডিত করেছেন তার পরিমাপ করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

সংগীতের ক্ষেত্রে নজরুল এক যুগন্ধর প্রতিভা। তাঁর অসামান্য সংগীতপ্রতিভার কিয়দংশের বর্ণনা করাও বুঝি এই অল্পায়তন নিবন্ধে অসম্ভব। রবীন্দ্রপ্রতিভা-ভাস্কর যখন মধ্য গগনে প্রখর তেজ বিকিরণে বিরাজমান তখনই বিদ্রোহী কবি-গায়ক-সুরকার নজরুল ইসলামের আবির্ভাব এক অজ্ঞাত-অখ্যাত শিল্পীরূপে। নজরুলের মতো সহায়-সম্বলহীন এক স্বল্পবিত্ত মুসলমান যুবককে কলাজগতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে এই পরিপ্রেক্ষিতে যে কী সংগ্রাম ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। নজরুলের সংগীত-সম্ভার শুধু সংখ্যাধিক্যে নয়—গুণগরিমায়ও অতুলনীয়। তিনি যে কত গান লিখে তাতে সুরারোপ করেছেন তার সঠিক সংখ্যা আজও নির্ণয় করা যায় নি। গানের অজস্রতায় ও সুর-বৈচিত্র্যে তাঁর গীতোপকরণ এক অনন্য-সাধারণ মর্যাদার আসন লাভ করেছে। নজরুলের গানের সংখ্যাবহুলতার কথা বাদ দিলেও তাঁর প্রতিটি গান সুর-বৈভবে তালে-ছন্দে ও ভাবৈশ্বর্যে এক একটি রত্ন রূপে গণ্য হবার যোগ্য। তাঁর সাগর-বিশাল সংগীত-সম্পদের বিচার-বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করা এক দুরূহ কাজ। সংগীত-মহলের এমন কোন প্রকোষ্ঠ অবশিষ্ট নেই যেখানে অবলীলাক্রমে বিচরণ করে তাকে তিনি সৌন্দর্যান্বিত না করেছেন।

বাঙলার সংগীত-সংস্কৃতি ভাণ্ডারকে নজরুল কতভাবে যে সমৃদ্ধ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। গানের কথার সঙ্গে সুরের সার্থক ও শুভমিলন ঘটিয়ে তাঁর সংগীত কৃতিতে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন—তা বাঙলা গানের জগতে চিরবরণীয় ও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর গান একদিকে যেমন সুরৈশ্বর্যে দ্যুতিময়—তেমন অন্যদিকে ভাবসম্পদ ও আবেগপ্রাবল্যে প্রাণবন্ত। বিদ্রোহী ও সাম্যবাদী কবি ছিলেন বলে তাঁর কাব্যে আমরা যেমন নব জীবন-যৌবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই, ঠিক তেমনি তাঁর বৈপ্লবিক মানসিকতা ছিল বলে তাঁর সংগীতসৃষ্টিতেও আমরা ভাঙা-গড়া ও নবসংযোজনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিদর্শন লক্ষ্য করি। সংগীতের ক্ষেত্রে নজরুল যেমন বিদেশী সুরসম্পদ আহরণ করে বাঙলাসংগীতের কলেবর বৃদ্ধি ও পুষ্ট করেছেন—তেমনি আরবী ও ফারসী ভাষা থেকে সুন্দর সুন্দর শব্দ চয়ন করে তিনি বাঙলাকাব্য ও বঙ্গ-ভারতীর ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধিশালী করেছেন।

নজরুলগীতির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই তার দেশাত্মবোধক তথা স্বদেশী গানের কথা মনে পড়ে। নজরুলের বলিষ্ঠ গীতাবলী বাঙলার স্বদেশী আন্দোলনে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। নিদ্রাচ্ছন্ন বাঙালীজাতির প্রাণে এনে দেয় এক নতুন স্পন্দন। পরাধীন জাতির বেদনা মর্মে মর্মে অনুভব করে তিনি স্বাধীনতাকামী বাঙালীর পরম আত্মীয় হয়ে ওঠেন। তাই তিনি গেয়ে উঠলেনঃ

এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল।

আবার কবি স্বরচিত সুরে গাইলেনঃ

কারার এই লৌহ কপাট
ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট শিকলপূজার পাষাণ-বেদী।

স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে কবি বহু গান বেঁধে তাতে সুর-সংযোজনা করেন। ঐ পর্যায়ের অনেক গান কোরাস শৈলীভুক্ত। ঐ গানগুলির মধ্যে 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' একটি অনবদ্য রচনা। এই গানটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল।

উল্লেখ্য, ১৯২৬ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের কৃষ্ণনগর অধিবেশনের জন্য কবি এ গানখানি রচনা করেন এবং নিজেই উদাত্ত কণ্ঠে গানখানি ঐ অধিবেশনে পরিবেশণ করেন।

অন্যান্য কোরাস গানগুলির মধ্যেও আমরা কবির স্বাদেশিকতা ও সংগ্রামী ভাবের দ্যোতনা দেখতে পাই। কবির মার্চের গানগুলির (March songs) অর্থাৎ যুদ্ধযাত্রার গানগুলির মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি বীররসের প্রাবল্য। তাঁর এই পর্যায়ের

গানগুলি সংগ্রামশীলতার দ্যোতক ও দেশপ্রেমবোধক। বাঙলার সংগীতে এইগুলি কবির নবতম অবদান। এইগুলির কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

১) ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চলরে চলরে চল।...ইত্যাদি

২) জননী মোর জন্মভূমি
তোমার পায়ে নোয়াই মাথা
স্বর্গাদপি গরিয়সী
স্বদেশ আমার ভারত মাতা।...ইত্যাদি

৩) ঝড় ঝঞ্ঝার ওরে নিশান
ঘন বজ্রে বিষাণ বাজে
জাগো জাগো তন্দ্রা অলসরে
সাজো সাজো রণসাজে।...ইত্যাদি

৪) টলমল টলমল পদভরে
বীরদল চলে সমরে।...ইত্যাদি

৫) শঙ্কাশূন্য লক্ষকণ্ঠে বাজিছে শঙ্খ ঐ
পুণ্যচিত্ত মৃত্যু-তীর্থ-পথের যাত্রী কই।
...ইত্যাদি

৬) বীরদল আগে চল
কাঁপাইয়া পদভরে ধরণী টলমল
যৌবন সুন্দর চিরসুন্দর।

৭) চলরে চপল তরুণ দল বাঁধনহারা
চল অমর সমরে চল ভাঙি কারা।

'মার্চে'র স্বর-গ্রন্থনায় নজরুলের সমকক্ষ প্রতিভা সত্যিই বিরল। এই সুরগুলির মধ্যে পাশ্চাত্য সংগীত তথা বিলেতি 'মার্চে'র সুরের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বাঙলার সংগীতাঙ্গনে সুরকার-কবি নজরুলের সব চাইতে বড় কীর্তি হল তাঁর গজল-শৈলীর গান। পারস্য দেশের প্রেম-গীতিকে গজল বলা হয়। গজলে নানা সুরে, কখনো বা রাগাশ্রিত হয়ে গীত হয়। বাঙলার তথা ভারতের সংগীত-ইতিহাসে গজল গানের প্রবর্তন করে নজরুল এক ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করেন। বাঙলা ভাষায় গজলের প্রবর্তক ও প্রচারক হিসাবে কবি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর গজলগুলি ধনীগৃহ থেকে দরিদ্রের কুটির পর্যন্ত অসামান্য লোকপ্রিয়তা অর্জন করে। তাঁর পরিচালনায় বিভিন্ন শিল্পী-গীত গ্রামোফোন রেকর্ডের মাধ্যমে এই গজলগুলি বাঙলার হাটে-বাটে-মাঠে-ঘাটে অনবরত গুঞ্জরিত হয়ে ফিরতে থাকে। ভাবুক বাঙালী প্রাণভরে এই গজল শ্রেণীর গানগুলিকে স্বাগত জানায়। প্রখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী আঙ্গুর-বালা দেবী, শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী ও শ্রীমতী কমলা ঝরিয়ার নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নজরুলের গজলগানে ভাষা ও সুরের সৌকুমার্য যেন গঙ্গা-যমুনার মিলন-মাধুর্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর বিখ্যাত গজলগুলির কয়েকটি প্রারম্ভিক স্তবক নিম্নে দেওয়া হলঃ

১) বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
পানিয়া ভরণে চললো গোরী—মিশ্র ইমন

২) আমারে চোখ ইসারায় ডাক
দিলে হায় কে গো দরদী।
খুলে দাও রং মহলের তিমির
দুয়ার ডাকিলে যদি।—মিশ্র ভৈরবী

৩) বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল
শাখাতে দিসনে আজি দোল।
আজো, তার ফুল কলিদের
ঘুম টুটেনি তন্দ্রাতে বিলোল।

৪) কেন আন ফুল ডোর
আজি এ বিদায় বেলায়।

৫) কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে
সুর-সোহাগে তন্দ্রা লাগে কুসুম-বাগের গুলবদনে।
—গারা-খাম্বাজ

৬) ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা সনে রহিল আঁকা
আজো সজনী, দিন রজনী, সে বিনে গণি তেমনি
ফাঁকা।

কাব্যগীতি বা কাব্যসংগীতের ক্ষেত্রেও নজরুল যে মুন্সিয়ানার নিদর্শন রেখে গেছেন বাঙলার সাহিত্যজগতে তার তুলনা মেলা ভার। প্রেমতৃষ্ণা ও প্রেমের আর্তি তাঁর গীতি-কাব্যে সার্থকরূপে প্রতিভাত হয়েছে। ব্যক্তি মানুষের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা ও বিরহ-মিলনের এমন ললিত-মধুর গান বোধহয় আর কোন কবি শুনিয়ে যান নি। নিচে কয়েকটি কাব্য-গীতির অংশবিশেষের উদাহরণ তুলে ধরছিঃ

১) প্রদীপ নিভায়ে দাও, উঠিয়াছে চাঁদ।
বাহুর ডোর আছে মালায় কি সাধ?

২) বিদায় সন্ধ্যা আসিল ঐ ঘনায় নয়নে অন্ধকার
হে প্রিয় আমার যাত্রা পথ অশ্রু-পিছল করো না আর।

৩) আমি তব দ্বারে প্রেম ভিখারী।
নয়নের অনুরাগ দৃষ্টির সাথে চাহি নয়ন বারি।

৪) গানগুলি মোর আহত পাখির সম
লুটাইয়া পড়ে তব পায়ে প্রিয়তম
বাণ-বেঁধা মোর গানের পাখিরে
তুলে নিও প্রিয় তব বুকে ধীরে,
লভিবে মরণ চরণে তোমার সুন্দর অনুপম॥

ভারতীয় সংগীতের অমূল্য সম্পদ রাগ-রাগিণীকে নজরুল তাঁর গানে যে কত বিচিত্রভাবে রূপায়িত করেছেন তার হদিশ পাওয়া ভার। প্রচলিত রাগ-রাগিণী ছাড়াও তিনি বহু অপ্রচলিত ও অর্ধলুপ্ত রাগে গান রচনা করেছেন। দক্ষিণ ভারতীয় রাগেরও তিনি সদ্ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন রাগের মিশ্রণেও তিনি আশ্চর্য নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। রাগ-প্রধান বা রাগাশ্রিত গানে তিনি নতুনত্বের স্বাদ এনেছেন।

ওস্তাদ দবীর খাঁ, ওস্তাদ জমিরউদ্দিন খাঁ, মঞ্জু সাহেব, মস্তান গামা ও মুর্শিদাবাদের রাগজ্ঞ ওস্তাদ কাদের বক্স্ প্রমুখ গুণীদের থেকে নজরুল রাগ সংগীতের তালিম নিয়ে-

ছিলেন এবং বহু চীজ্ শিখেছিলেন।

কবির রাগাভিত্তিক গানগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রাগাঙ্গ গানগুলির প্রভেদ বিদ্যমান। নজরুলের রাগ সংবলিত গানের রূপায়ণে সুরবিহার (Improvisation) স্বীকৃত; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে তা নিষিদ্ধ। নজরুলের রাগপ্রধান গানের কিঞ্চিৎ এখানে উল্লেখ করা হলঃ

১) শূন্য এ বুকে পাখি মোর
আয় ফিরে আয় ফিরে আয়।
তোরে না হেরিয়া সকালের ফুল
অকালে ঝরিয়া যায়।—ছায়ানট

২) অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে।
প্রদীপ-শিখা-সম কাঁপিছে প্রাণমন
তোমারে, সুন্দর, বন্দিতে।
সঙ্গীতে সঙ্গীতে॥—তিলং

৩) ওর নিশীথ সমাধি ভাঙিও না।
মরা ফুলের সাথে ঝরিল যে ধূলি পথে
সে আর জাগিবেনা, তারে ডাকিও না।
—দরবারীকানাড়া

নবরাগ সৃষ্টিতে নজরুলের সৃজনীপ্রতিভা নিয়োজিত হয়েছিল। 'শিবসরস্বতী', 'অরুণরঞ্জনী', 'দেবযানী', 'সন্ধ্যামালতী'· 'বনকুন্তলা', 'মীনাক্ষী', 'শঙ্করী', 'নির্ঝরিণী', 'দোলন চম্পা' ও আরো অনেক নতুন নামের নতুন রাগ রচনা করে তিনি গান বেঁধেছিলেন।

বিদেশী সুর-সম্পদকেও নজরুল বাঙলা গানে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগান। এই প্রসঙ্গে তাঁর কয়েকটি গানের নমুনা দেওয়া হলঃ

১) মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে নেচে যায়।
বিহবল চঞ্চল পায়॥
—ইজিপ্সিয়ান্ সুর

২) চমকে চমকে ধীরু ভীরু পায়
পল্লী-বালিকা এক বন পথে যায়।
—আরবী সুর

৩) দূর দ্বীপ-বাসিনী, চিনি তোমারে চিনি।
দারুচিনির দেশে তুমি বিদেশিনী গো, সুমন্দভাষিণী।
—কিউবান্ নাচের সুর

৪) রুম ঝুম ঝুম ঝুম রুম ঝুম ঝুম
খেজুর পাতার নূপুর বাজায়ে।
—মুরিশ্ মেলডি

হিন্দুস্থানী সংগীতের ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা-ঠুংরী রীতির অনুসরণে গান রচনা ছাড়াও নজরুল কাওয়ালী, লাউনী-কাজরী, চৈতি, দাদ্রা, গীত প্রভৃতি নানা ভঙ্গিম গানও তাঁর সুরকৃতিতে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। শ্যামা-সংগীত, ভজন নাত (মোহাম্মদের নামযুক্ত ইসলামী গান) হজ জাকাতের গান, নমাজ রোজার গান, মারফতী গান, ঈদের গান প্রভৃতি কত ধর্মীয় গান যে তিনি রচনা করে গেছেন—তার হিসাব-নিকাশ নেই। কীর্তন, পল্লী-গীতি, লোকসংগীত তথা বাউল—ভাটিয়ালি, ঝুমুর, দেহাতী ধুন, লেটোর গান, হাস্যরসাত্মক গান, দ্বৈত সংগীত, শিশু-সংগীত প্রভৃতি প্রতিটি বিভাগেই নজরুল সব্যসাচীর মতো সুর বিলিয়ে সংগীতানুরাগীদের মাতিয়ে রেখেছেন। তাই বাস্তবিক পক্ষে নজরুলের গীত-প্রতিভা-পদ্ম শতদলে বিকশিত হয়েছে।

উপসংহারে, একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় বলেই সসঙ্কোচে বলার এই যে, আমি নজরুলের অর্থাৎ সর্বজনপ্রিয় কাজীদার ঘন সান্নিধ্যে এসেছিলাম। এবং তাঁর প্রীতি-ভালবাসা পরিপূর্ণভাবে পেয়েছিলাম যা আজও আমার জীবনের একটি পরম সম্পদরূপে আমি গণ্য করি। তাঁর পরিচালনায় তাঁরই কয়েকটি গান গ্রামোফোন রেকর্ডে পরিবেষণ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবং ঐ গানগুলি আশাতিরিক্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

পরিশেষে অগণিত দেশবাসীর সঙ্গে বাঙলার চির প্রিয় কালজয়ী কবি-সুরকার নজরুলকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ ও প্রণতি। নজরুলজয়ন্তীতে তাঁর অমর স্মৃতি বাঙলার শিল্পকলাকে শুভপথে পরিচালিত করুক এই কামনা করি।

দারিদ্র্য ও নজরুল

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়

'দারিদ্র্য' কবিতাটি নজরুল লেখেন ২৪ আশ্বিন ১৩৩৩ সালে (১৯২৬-এর অক্টোবরের প্রথম)। এই কবিতাটির ভিতর নজরুলের জীবনের সংগ্রামী রূপ ফুটে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের শোষণে সমাজ-জীবনের ভয়াবহতার রক্তাক্ত দৈত্য-দংষ্ট্রার পেষণে মানব-জীবন অতিষ্ট—এই কবিতায় সেই সুরটি যেন ফুটে উঠেছে। সেই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, উঠতে বাধ্য হয়,—কবিতার মূল বক্তব্য তাই।

বর্তমানে আমরা কবিতা, সাহিত্য পড়ি বটে, কিন্তু গান, কবিতা, গল্পের ভাষাকে অনুসরণ করে জীবনকে গড়ে তোলার কোন চেষ্টা করি না। উপরন্তু আমরা কবি ও রচয়িতার ভাষাকে যথার্থ হৃদয়ঙ্গম না করে তাঁদের ভাষাকে পরিবর্তন করে কায়েমী স্বার্থের হয়ে কাজ করছি।

নজরুল জন্মাবার পর থেকেই দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেছেন। লড়াই করেছেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। এই লড়াই করতে গিয়ে কত প্রতিভার অপমৃত্যু হয়েছে; যেসব কবি সাহিত্যিক নজরুলের মত বলিষ্ঠতায় রুখে দাঁড়াতে পারেনি তারা শিকার হয়েছে অপসংস্কৃতির। তারা যে সে পথে দেশের জন-চিত্ত, জন-গণ-রুচিকে নিকৃষ্ট পথের যাত্রী করে চলেছে সে কথা আজ সকলেই জানি। কিন্তু নজরুল তাঁর জীবনে এই দারিদ্র্যের নেহাইয়ে, অভাবের আগুনে পুড়ে স্বৈরতান্ত্রিক, সামন্ত যুগীয় কুসংস্কারের হাতুড়ীর ঘায়ে ইস্পাতের মত জীবনকে দুধারী তলোয়ারের মত গড়ে, স্বৈরতন্ত্র, পুঁজিবাদের ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অমর হয়ে গিয়েছেন।

জ্ঞান আহরণের জন্য আকুল হয়ে গৃহ ছাড়া হয়ে তের বছর বয়সে, বর্ধমানের মাথরুন স্কুলে গিয়েছেন। সেখান থেকে মৈমনসিংহের দরিরামপুরে, সিয়ারসোল রাজ স্কুলে। চলে-গিয়েছেন যুদ্ধক্ষেত্রে দেশোদ্ধারের অগ্নি-মন্ত্র বুকে নিয়ে। দারিদ্র্যকে অষ্টরম্ভা প্রদর্শন করে ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন স্বাধীনতার উজ্জ্বল-শপথ নিয়ে।

নজরুলকে অভাবের কশাঘাত বিধ্বস্ত করতে পারেনি, বরং এই অবস্থায় যেন দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তাঁর বুদ্ধি, বিচার, বিশ্লেষণ, সংকল্প উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে; তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, হয়ে উঠেছে ক্ষুরধার। নজরুল-জীবনের এই বাস্তবতার ভাবমূর্তি আজ বামপন্থী সরকারকে হাতিয়ার করে দেশের জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে শোষক সমাজের মারণাস্ত্র রূপে।

নজরুল-জীবন গড়ে উঠেছিল, যুগান্তর বিপ্লবী দলের নেতা নিবারণ ঘটকের বিপ্লবী সাধনার পদ্ধতিতে। পরবর্তী কালে শত অভাব অনটন সয়েও যিনি ভারতে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সূচনা করেছেন সেই মহান নেতা কমরেড মুজফ্ফরের শিক্ষায়, সান্নিধ্যে তাঁর জীবন গড়ে উঠেছিল। তাই তিনি বলবার দুঃসাহস প্রকাশ করেছেন ঃ

> "হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান।
> তুমি মোরে দানিয়াছ খৃষ্টের সম্মান
> কন্টক-মুকুট-শোভা।"

শোষক পুঁজিবাদী সমাজের অপব্যবস্থার দরুন মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, মেহনতি জনতা কৃষক শ্রমিক সমাজ শ্রম বিক্রয় করেও দুবেলা অন্নের অধিকারী নয়। হতাশায় নানা অপসংস্কৃতির পথে তাই তারা জীবনের অবক্ষয়ের পথের যাত্রী হচ্ছে, তাদের সামনে নজরুলের উপরোক্ত কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তুলে ধরতে হবে। তার অর্থকে সুপরিস্ফুট করে অর্থনৈতিক জয়যাত্রার শরিক করে গড়ে তুলতে হবে। যে পুঁজিবাদী সমাজ নিত্য অভাব সৃষ্টি করে নিজেরা মুনাফা লুটছে; তাকে পথের ধুলায় নামিয়ে আনার সংগ্রামে জয়ী করে তুলতে হবে। সে যেন স্পর্ধাভরে বলতে পারে—

...........দিয়াছ তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি; বাণী ক্ষুরধার;
বীণা মোর শাপে তব হল তরবার।"

বিশ্বের বিভিন্ন চরম সংগ্রামে সফল হয়ে যাঁরা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলেছেন তাঁদের সঙ্গে একযোগে বর্তমানের দারিদ্র্য নিষ্পেষিত জনগণ যেন মার্কসীয় দৃষ্টি লাভ করে পুঁজিবাদী সমাজকে নির্মূল করে সমাজতান্ত্রিক ভারত গড়ে তুলে গর্দান খাড়া করে দাঁড়াতে পারে। আত্মসুখসর্বস্ব মুষ্টিমেয় স্বৈরচারী শাসকদের বিরুদ্ধে দুর্বাসার ন্যায় দুর্বার হয়ে জনমানসকে প্রতিহত করার আহ্বান জানিয়ে নজরুল বলেছেন—

"ভিক্ষা-ঝুলি নিয়া ফের দ্বারে দ্বারে ঋষি
ক্ষমাহীন দুর্ব্বাসা! যাপিতেছে নিশি
সুখে বর-বধূ যথা, সেখানে কখন
হে কঠোর-কণ্ঠ গিয়া ডাক; 'মূঢ় শোন্,
ধরনী বিলাস-কুঞ্জ নহে নহে কারো,
অভাব বিরহ আছে আছে দুঃখ আরো,
আছে কাঁটা শয্যাতলে বাহুতে প্রিয়ার
তাই এবে কর ভোগ।"

মানুষের শ্রম থেকে উৎপাদনের মুনাফা লোটে যে শোষক-সমাজ তাদের ধ্বংসের জন্য জনগণকে এই বিলাস বিরোধী দুর্বাসার অটল সংকল্পকে গ্রহণ করাতে হবে। তাদের শোষনের ভদ্র-বিনয়-এর ভণ্ডামীর মুখোস টেনে ছিঁড়ে চিনিয়ে দিতে হবে। নজরুল বলেছেন—

"বিনয়ের ব্যভিচার নাহি তব পাশ
তুমি চাও নগ্নতার উলঙ্গ প্রকাশ।"

ছেলেমেয়ের মুখে এক চুমুক ভাতের ফ্যান দিতে পারে না, নুনের ছিটে দেবারও পয়সা নেই অথচ পুঁজিপতির ব্যাঙ্কে টাকার পাহাড় গড়ে উঠছে যাদের শ্রমে, তাদের কথা বলেছেন—

"দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি।"

এই বেদনা থেকে কী করে মুক্ত হওয়া যায়, তার পথ কোথায়, তাই বললেন

..............কে বাজাবে বাঁশী?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি?
কোথা পুষ্পাসব?—ধুতুরা-গেলাস
ভরিয়া করিছে পান নয়ন নির্য্যাস।"

"পুষ্পাসব," মধু। শ্রমিক মৌমাছিরা মধু আহরণ করে, সেই মধু আসব (মদ) রূপে ঠোঁটে তুলে নেয় দুগ্ধফেননিভ শয্যা-বিলাসী ধনীরা। যারা শ্রম করে তারা ধুতুরাকে পান-পাত্র করে।

একদা নজরুল "কিষাণের গানে" লিখেছিলেন,—

"গলায় গলায় গান ছিল ভাই
গোলায় গোলায় ধান
এখন কোথায় বা সে গান গেল ভাই
কোথায় সে কিষাণ

মোদের রক্ত জল হয়ে আজ
ভরতেছে বোতল।"—

অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজ কৃষককে উপবাসে রেখে চাল ফুটিয়ে মদ তৈরী করে মাতলামো করছে।

'দারিদ্র্য' কবিতাটি কবি কৃষ্ণনগরে থাকতে লিখেছিলেন। সেখানে হেমন্তকুমার সরকার তাঁকে হুগলী থেকে নিয়ে যান। কৃষ্ণনগরে প্রথম দিকে হেমন্ত বাবুর ও তাঁর পরিবারবর্গের অকুণ্ঠ সাহায্যে দিন ভালোই কাটছিল। কিছু দিন পর তাঁদের সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়, তখন তিনি সরকার বাড়ী ছেড়ে "গ্রেস কটেজ" ভাড়া নিয়ে বাস করেন, সেখানেই এই কবিতাটি লেখা।

নজরুলের মেজ ছেলে "বুলবুল" তখন জন্মেছে, প্রকাশকরা তাঁর বই থেকে মুনাফা লুটছে। তাঁকে টাকা দেবার বেলায় সময় ক্ষেপণ করে। লিখেই সংসার নির্বাহ হত তাঁর। তখনও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি বাংলা তথা বাংলার বাইরে ছুটো ছুটি করছেন—অভাব-রাক্ষসী সংসারটাকে জাপটে ধরেছে। যদিও কোথা থেকে টাকা পান তাহলে অভাবী বন্ধুরা দুয়ারে হাত পাতলে উজার করে দেন। পিছনের কথা ভাবেনওনা। (১)

দারিদ্র্য নজরুলের পাশে পাশে শয়তানের মত চলেছিল, যেমন চলেছিল খৃষ্টের চল্লিশ দিন সাধনার পর। খৃষ্ট যেমন শয়তানকে ভ্রূক্ষেপ না করে জনগণ-কল্যাণের জন্য বাণী প্রচার করেছিলেন, নজরুলও তেমনি দারিদ্র্য-শয়তানকে আমল না দিয়ে ১৯২০ সাল থেকে ৩০ সাল পর্যন্ত অকুতোভয়ে স্বাধীনতা অর্জনে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন, দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, ঘরে ঘরে, পত্র-পত্রিকায়, কণ্ঠে, লেখনীতে, কাজে। বিপ্লবের বাণী, কৃষক-শ্রমিকের স্বাধীনতা আদায়ের কথা লিখেছেন "সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ" ১৯২০ মুজফ্ফর এর সহযোগী হিসাবে। ১৯২২ সালে "ধূমকেতু অর্দ্ধ সাপ্তাহিকে" মুজফ্ফর এর সহ-যোগিতায়; ১৯২৫ সালে "লাঙল সাপ্তাহিকে" মুজফ্ফরের সহায়তায়। ১৯২৬ সালে মুজফ্ফরের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক "গণবাণী"তে লেখক রূপে। ১৯২৫ সালে ওয়ার্কার্স এন্ড পেজেন্ট পার্টি" গঠনে তৎকালীন মার্কস্বাদীদের মধ্যেও তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রণী কর্মী। তখনও তিনি পরিবার নিয়ে দারিদ্র্যের সঙ্গে সমানে লড়ে চলেছেন। সংগ্রামী নজরুলের কথা দিয়েই শেষ করি—

"হে সুন্দর, মোরা তব দূর যাত্রা পথ
করিতেছি সহজ সরল, রচিতেছি তব ভবিষ্যৎ।
সতেজ তরুণ কণ্ঠে তব আগমনী
গাহিতেছি রাত্রিদিন; দৃপ্ত জয়ধ্বনি
ঘোষিতেছে আমাদের বাণী বজ্র-ঘোষ!
বুকে জ্বালিতেছি বহ্নি—অসন্তোষ।
আশার মশাল জ্বালি আলোকিয়া চলেছি আঁধার
অগ্রদূত নিশান-বর্দার।" (২)

(১) "কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা"—মুজফ্ফর আহমদ, "কাজী নজরুল"—প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। "কৃষ্ণনগর ও দরদী অধ্যায়," "নজরুল কথা"—শান্তিপদ সিংহ প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
(২) সিন্ধুহিন্দোল—নজরুল, পৃষ্ঠা ৫৬।

গণসঙ্গীতের পথিকৃৎ কাজী নজরুল

কল্পতরু সেনগুপ্ত

গণসঙ্গীত কথাটার সঙ্গে আজকাল আমরা বিশেষভাবে পরিচিত। গণসঙ্গীত কথাটা শুনলে সংগ্রামী মানুষের চিত্রকল্প ফুটে ওঠে; সভা মিছিল, শ্রমিকদের মজুরি ও কাজের আন্দোলন, ছাত্রদের শিক্ষার আন্দোলন কৃষকদের জমি ও ধানের জন্য সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও মুক্তি সংগ্রামের ছবি মনে পড়ে। লোক-সঙ্গীত বলতে আমাদের চোখে ভেসে ওঠে পল্লীগ্রামের ছবি; মাঠের রাখাল, কৃষক সমাজ, মাঝিমাল্লা, বাউল এবং উৎসবের দিনে গ্রামের মেয়েদের কথা। গণসঙ্গীতে প্রকাশ পায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সংকল্প, ঐক্যে বিশ্বাস এবং জীবনকে সুন্দর করে তোলার আগ্রহ। লোকসঙ্গীতে থাকে শ্রমের আনন্দ, জীবনকে মহতো মহীয়ান করে তোলার আকুতি। গণসঙ্গীত নবীন, তার জন্ম গণসংগ্রামের তরঙ্গে তরঙ্গে। লোকসঙ্গীত ও গণসঙ্গীত পরস্পর ঘনিষ্ঠ, দুইই জনগণের শ্রম ও সংগ্রামের সৃষ্টি, জন-সাধারণের জীবনীশক্তির প্রকাশ।

সুরের পথ ধরে মানুষ মুক্তির পথ খুঁজেছে। একথাটা আধ্যাত্মিক দিক থেকে যেমন সত্য রাজনৈতিক দিক থেকেও প্রযোজ্য। নজরুলের সুরের ঝঙ্কারে বিশ দশকে ঘুমন্ত মানুষ জেগেছে। "বাংলার বিপ্লবীদের কণ্ঠে তিনি দিলেন গান। ভাঙার আবেগ আর সৃষ্টি সুখের উল্লাসের এ গান দেশের যুবসমাজকে ঘরের বার করে আনল দেশের মুক্তি সংগ্রামে। শিকল ভাঙার গান দেশের তরুণদের প্রাণে জাগাল দেশের কাজে আত্মদানের আগ্রহ (নজরুলগীতি অন্বেষা)।

আমাদের দেশে গণসঙ্গীত কাথাটা আজ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তার সূচনা করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। ত্রিশ দশকে শ্রমিক কৃষক ছাত্র নারীদের কণ্ঠে তিনি দিয়েছেন মুক্তির গান, যে গান তাঁদের সঙ্ঘবদ্ধ হবার এবং পথের বাধা দূর করে এগিয়ে যাবার প্রেরণা দিয়েছে। কাজী নজরুল রচনা করেছেন জাতীয় মুক্তি-যুদ্ধের রণসঙ্গীত। যা আজও দেশবাসীর প্রাণে জাগায় সব রকমের বন্ধনমুক্তির উন্মাদনা। অগ্নিদিনের কবি তিনি, মুক্তি সঙ্গীতের সুরকার। তাই তিনি জনগণের মনে বিদ্রোহী কবি বলে সম্মানীত, গণসঙ্গীতের পথিকৃৎ বলে স্মরণীয়।

"চল চল চল
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চলরে চলরে চল॥"

অথবা

"টলমল টলমল পদভরে
বীরদল চলে সমরে।"

গাইতে গাইতে রক্তে যেন আগুন ধরে যায়। এগিয়ে চলার সংকল্প জাগায়।

কাজী নজরুল ইসলাম স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দেশ্যে সামরিক শিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছায় প্রথম মহাযুদ্ধের কালে সৈন্য-বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। সৈন্যবাহিনী থেকে ফিরেছিলেন নভেম্বর বিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধা ও সোভিয়েত মধ্য এশিয়ায় গৃহযুদ্ধে লালফৌজের সহযোগী ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের বীরত্ব ও ত্যাগের অনুপ্রেরণা নিয়ে। বহু সংখ্যক ভারতীয় তখন সীমান্ত অতিক্রম করে সোভিয়েত ইউনিয়নে চলে গিয়েছিলেন এবং তাঁরা লালফৌজে যোগ দিয়ে বিপ্লববিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। সেই মহান যুদ্ধে বহু ভারতীয় প্রাণ দিয়েছেন, অনেকে বীরত্বের জন্য সম্মানীত হয়েছেন। করাচী ও অন্যান্য সৈন্যব্যারাকে থাকা কালে নজরুল রুশ বিপ্লবের ইস্তাহার ইত্যাদি পাঠ করেছিলেন এবং বিপ্লবের তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। কাজী নজরুল বুঝেছিলেন নভেম্বর বিপ্লব সারা দুনিয়ার পরাধীন মানুষের মুক্তির পথ করে দিল। তাঁর এই অনুভূতির প্রকাশ হয়েছে তাঁর লেখা 'ব্যথার দান' উপন্যাসে। এবং নভেম্বর বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়ে 'প্রলয়োল্লাস' (১৯২২) কবিতায়। পরে তাঁরই সুর সংযোজনায় যা এক অভিনব গণসঙ্গীত হয়েছে।

"তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
"তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে
কাল বোশেখীর ঝড়।"

কাজী নজরুল দেশে ফিরেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশেষ করে শ্রমিক কৃষক আন্দোলন সংগঠন করার সংকল্প নিয়ে। কমরেড মুজফ্ফর আহমদ তাঁর "আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি" বইতে লিখেছেন—"উনপঞ্চাশ বেঙ্গলী ব্যাটালিয়ন ভেঙে যাওয়ার পরে ১৯২০ সালের মার্চ মাসে কাজী নজরুল ইসলাম পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুসারে কলকাতায় আমার সঙ্গে থাকতে আসে।...কথা হয়েছিল যে নজরুল ইসলাম কলকাতায় কাব্য ও সাহিত্য চর্চা করবে এবং রাজনীতিতেও যোগ দেবে" (পৃঃ ৬১)। কাজী নজরুল সাহিত্য চর্চা শুরু করলেন রাজনৈতিক আদর্শ সামনে রেখে। তাঁর 'ভাঙার গান' বিপ্লবী দলগুলির যুবকদের মধ্যে এক উন্মাদনা শক্তি জাগিয়ে তুলল :

"কারার ঐ লৌহ কবাট
ভেঙে ফেল, কররে লোপাট
রক্তজমাট
শিকল পূজার পাষাণ বেদী!"

বিপ্লবী যুবকরা মৃত্যুকে তুচ্ছ করে এগিয়ে যাবার, নিজেদের পুনর্গঠিত করার সংকল্প গ্রহণ করল। তিনি তাঁদের অভয় বাণী শোনালেন—

"বল ভাই মাভৈ মাভৈ
নবযুগ ঐ আসে ঐ।"

১৯১৫ সালে ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের যে পরিকল্পনা বিপ্লবীরা গ্রহণ করেছিলেন, সেই কর্মসূচি ব্যর্থ হওয়ায় অস্ত্র-শস্ত্রসহ মেভারিক জাহাজ ধরা পড়ে গেল, অস্ত্রের জাহাজ থেকে অস্ত্র আনতে গিয়ে বালেশ্বরে যতীন মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সঙ্গীরা পুলিসবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিলেন, রাসবিহারী বসুরা বিদেশে চলে গেলেন। এই ব্যর্থতায় বিপ্লবীদের মধ্যে হতাশা এসেছিল। সেই হতাশার বিরুদ্ধে নতুন উদ্যমে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নজরুলের গণসঙ্গীত উৎসাহ সঞ্চার করল। তিনি গাইলেন—

"এস ওগো মরণ
এই মরণ-ভীতু মানুষ মেষের
ভয় কর গো হরণ॥"

বিপ্লবী যুবশক্তিকে অনুপ্রেরণা দিয়ে দমননীতির বিরুদ্ধে লড়বার শক্তি ও বিপ্লবী চরিত্রের দৃঢ়তা জানালেন—

"এই শিকল পরা ছল মোদের
এ শিকল পরা ছল।
এই শিকল পরে শিকল তোদের
করবরে বিকল॥"

বিপ্লবীরা আন্দামানে দ্বীপান্তরিত, কারাবাসে নির্যাতীত, ফাঁসির মঞ্চে আত্মদান করেছেন, আত্মগোপন করে সংগঠন চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সর্বত্যাগী দেশপ্রেমিকদের কথা তিনি শ্রদ্ধার সাথে দেশবাসীকে স্মরণ করে দিয়ে অভয়বাণী শোনালেন—

"আমি রক্ত নিশিভোরে
একি এ শুনি ওরে
মুক্তি কোলাহল বন্দি-শৃংখলে,
ঐ কাহারা কারাবাসে
মুক্তি হাসি হাসে
টুটেছে ভয়বাধা স্বাধীন হিয়া তলে॥
ওরা দুপায়ে দলে গেল মরণ-শংকারে
সবারে ডেকে গেল শিকল-ঝঙকারে।"

ঔপনিবেশিক মুক্তি সংগ্রামে ছাত্রদের বিশেষ এক ভূমিকা থাকে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্ররা সংগঠিত বাহিনী এবং ত্যাগ ও সংগ্রামের তাদের এক গৌরবময় ভূমিকা রয়েছে। আমাদের দেশেও পরাধীনতার শৃংখল মুক্তিতে ছাত্র সমাজ অগ্রগামীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে পরবর্তী বিপ্লবীরা আত্মদানে এগিয়ে এসেছিলেন ছাত্র সমাজ থেকে। মুক্তি সংগ্রামে স্পর্ধিত প্রাণ এই ছাত্রদের উদ্দেশে নজরুল গাইলেন—

"আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মুর্ছে তুফান
ঊর্ধ্বে বিমান ঝড় বাদল।
আমরা ছাত্র দল।"

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশ শাসন করেছে বিভেদ নীতিতে। হিন্দু মুসলমান এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ এবং অবিশ্বাস সৃষ্টি করে ঔপনিবেশিক নীতিকে কার্যকরী করেছে। এই নীতিতেই মাঝে মাঝে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধত। সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টিতে কেবল ইংরেজ শাসকরা নয়—দেশীয় মিল মালিক জমিদার মহাজনরাও উস্কানি দিত। যাতে হিন্দু মুসলমান শ্রমিক আর কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে। স্বাধীনতা এবং শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে হিন্দু মুসলমান মেহনতি মানুষের ঐক্য ছিল অবশ্য প্রয়োজন। ১৯২৬ সালে কলকাতায় ভয়ঙ্কর এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছিল। কাজী নজরুল ছিলেন সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতার উর্দ্ধে। তাঁর জীবনাদর্শ ছিল সকল মানুষ এক, তাঁর ধর্ম ছিল মানবতার ধর্ম। তাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তিনি গভীর ব্যথিত ও বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। এই ব্যথা বিচলিত মন নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রামী অভিব্যক্তি জানালেন সম্পাদকীয় রচনায়, কবিতায়, সঙ্গীতে। তিনি এমন এক কোরাস বা সমবেত সঙ্গীত রচনা করলেন ভাবে ছন্দে সুরে যার তুলনা এদেশের সঙ্গীতে নেই। উদাত্ত কণ্ঠে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক (কংগ্রেস) সম্মেলনে গাইলেন—

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার।"

হিন্দু-মুসলমান ধর্মে স্বতন্ত্র কিন্তু এক জাতি বাঙালী। বাংলার শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সৃষ্টি। একথা স্মরণ করে দিয়ে তিনি গাইলেন—

"মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান
মুসলিম তার নয়নমণি হিন্দু তাহার প্রাণ।"

হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বিরুদ্ধে তিনি বহু গান রচনা করেছেন, এবং বিভিন্নস্থানে নিজেই সভা-সমিতিতে গেয়েছেন। এই গান-গুলির মধ্যে কয়েকটি শ্লেষাত্মক। যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারে না তারা আজ ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। তিনি গাইলেন—

"মাভৈ মাভৈ এতদিনে বুঝি জাগিল ভারতে প্রাণ,
সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান গোরস্থান।"

হিন্দুদের মধ্যে যারা জাত বেজাতের সংকীর্ণতায় জাতিকে পঙ্গু করে রাখছে তাদের ব্যঙ্গ করে তিনি গাইলেন—

"জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া।"

ভারতে কবি সুরকার শিল্পীদের মধ্যে নভেম্বর বিপ্লবে অনুপ্রাণিত অগ্রগামীদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম যে প্রধান একথা আগে লিখেছি। সেকালে কংগ্রেসের রাজনীতিকদের স্থবিরতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মুহূর্তে কাজী নজরুলই "ধূমকেতু"তে সর্বপ্রথম 'পূর্ণস্বাধীনতা'র দাবী তুলেছিলেন (১৯২২)।

কংগ্রেস তখনও হোমরুল কি ডোমিনিয়ন স্টেটাসের দাবী করবে তা নিয়ে দ্বিধায় রয়েছে। নজরুল এই ভীরু মানসিকতাকে ব্যঙ্গ করে লিখলেন—"বগলবাজা দুলিয়ে মাজা বসে কেন এমনিরে/ ছেঁড়া ঢোলে লাগাও চাটি মা হবেন আজ ডোমনীরে।" ঔপ-নিবেশিক শৃংখল মুক্তির সঙ্গে স্বাধীনতার রূপ কি হবে তা নিয়ে কাজী নজরুল চিন্তা করেছিলেন এবং অগ্রগামী চিন্তাধারায় তিনি বুঝেছিলেন রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা চাই। এবং সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হলে জনগণ স্বাধীনতার স্বাদ পেতে পারে না।

কমরেড মুজফ্ফর আহমদ "কাজী নজরুল ইসলাম—স্মৃতিকথা'য় লিখেছেন "১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে নজরুল আর আমি ঠিক করি যে আমরা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে এগিয়ে যাব। পড়াশুনা করব বলে কিছু বইও কিনেছিলাম। এই অবস্থাতেই ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে নজরুল তাঁর 'বিদ্রোহী' লিখেছিলেন।" কাজী নজরুল বিপ্লবের পথে যুবক-দের অনুপ্রাণিত করে গণসংগীত রচনার সঙ্গে শ্রমিক কৃষকদের সংগঠিত করার জন্য গান লিখেছেন। বাংলাসংগীতজগতে তাঁর আগে কেউ শ্রেণীসংগ্রামের চেতনা নিয়ে গান লেখেননি। শ্রমিক আন্দোলনের তাঁর গান—

ওরে ধ্বংস পথের যাত্রীদল!
ধর হাতুড়ি তোল কাঁধে শাবল।"

এই গান সেকালে শ্রমিকসভায় গাওয়া হতো। নজরুলতো গেয়েছেনই বিভিন্ন শ্রমিকসভায়। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে প্রয়াত শ্রমিক নেতা কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরীর কথা। তিনি বক্তৃতা করার আগে কখনও একক, কখনও সমবেত কণ্ঠে এই গানটি গাইতেন। যাঁরা এদেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রাথমিক প্রচেষ্টায় প্রথমে লেবর স্বরাজ পার্টি ও পরবর্তীকালে ওয়ার্কার্স এন্ড পিজান্টস পার্টি গঠন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নজরুলের ভূমিকা প্রধান ছিল। এই উদ্যোগের পরবর্তী প্রচেষ্টা বঙ্গীয় কৃষক লীগ গঠন। কৃষকদের জন্য তিনি গান রচনা করলেন—

"ওঠরে চাষী জগদ্বাসী ধর কসে লাঙল।
(আমরা) মরতে আছি ভালকরে মরব এবার চল॥"

এই পর্যায়ে তিনি ধীবরদের জন্য গান রচনা করেছেন মৎস্যজীবী সম্মেলন উপলক্ষে। ছাত পেটানো শ্রমিকদের জন্য গান লিখে-ছেন—"সারাদিন পিটি কার দালান।" বিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। চটকলে ধর্মঘট হয়েছে, রাস্তায় রাস্তায় শ্রমিক মিছিল বার হচ্ছিল, ১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে নিজেদের কথা বলতে শ্রমিকরা মিছিল করে পার্ক সার্কাস ময়দানে গিয়েছিল। এতবড় শ্রমিক মিছিল একটা বিস্ময়কর দৃশ্য ছিল। শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক লাল পতাকা শ্রমিকদের হাতে। কাজী নজরুল বিশ্ব শ্রমিকের রেড ফ্ল্যাগ গানটিকে বাংলায় সুর দিলেন—

"ওড়াও ওড়াও লাল নিশান।
দুলাও মোদের রক্ত পাতাকা
ভরিয়া বাতাস জুড়িবিমান।
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান॥"

শ্রমিকদের কণ্ঠে উঠল এই গান। একদিন নজরুলের বিপ্লবী গান গেয়ে বাংলার যুবকরা ঘরের বার হয়েছে মাতৃভূমির শৃংখল-মুক্তিতে আত্মাহুতির জন্য। এখন শ্রমিক শ্রেণী লাল পতাকার গান গেয়ে, কৃষকরা জাগরণী গান গেয়ে নবজীবনের আগমনী ঘোষণা করছিল। কাজী নজরুল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন এবং কমিউনিস্ট ইন্টার-ন্যাশনালের পত্র-পত্রিকা তাঁর হাতে আসত। অবিভক্ত বাংলায় তখন কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছে। নজরুল শ্রমিক কৃষকের জন্য গান দিয়েছেন, এবার কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের গান দিলেন অনুবাদ করে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সংগীত এক আশ্চর্য গান। জগতের সব দেশের মানুষ নিজের মাতৃভাষায় এ গান গায় কিন্তু সুর একই। শুনতে মনে হয় যেন সব দেশের মানুষ একই ভাষায় গাইছে। কমিউনিস্ট ভ্রাতৃত্ববোধের এবং 'দুনিয়ার শ্রমিক এক হও' এই শ্লোগানের মহৎ অনুপ্রেরণার সঙ্গীত এই 'ইন্টার ন্যাশনাল'। কাজী নজরুল এই সংগীতকে অনুবাদ করেছেন 'অন্তর-ন্যাশনাল' নাম দিয়ে—

"জাগো—
জাগো অনশনবন্দী, উঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত॥
যত অত্যাচারে আজ বজ্রহানি
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিতবাণী,
নব জনম লভি অভিনব ধরণী
ওরে ঐ আগত॥"

এই আন্তর্জাতিক গানটির ভারতে প্রথম অনুবাদ করেছেন কাজী নজরুল। তারপরে আরো তিনজনে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। হিন্দী উর্দু তেলেগু মালয়ালম ইত্যাদি ভাষায়ও পরবর্তীকালে অনুবাদ হয়েছে। নজরুলের অনুবাদ ১৯২৭ সালের ২১শে এপ্রিল 'গণবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ত্রিশের দশকে কাজী নজরুল ইসলাম গ্রামোফোন কোম্পানী, রেডিও, চলচ্চিত্র, নাট্যশালা ইত্যাদির সঙ্গে এত যুক্ত হয়ে পড়েন যে তখন তিনি আর শ্রমিকশ্রেণীর গণসংগীত রচনা করতে পারেননি। বিপ্লবী সংগঠন থেকেও তখন তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাঁর শেষ গণসংগীত রচনা বাকশক্তি হারাবার পূর্ব মুহূর্তে ১৯৪২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। ভারতে চিয়াং কাইসেকের আগমন উপলক্ষে চীন ভারত মৈত্রীর উদ্দেশে যুদ্ধ বিধ্বস্ত চীনের প্রতি ও দু-দেশের জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন—

"চীন ও ভারত মিলেছি আবার মোরা শত কোটি লোক।
চীন ভারতের জয় হোক! ঐক্যের জয় হোক! সাম্যের জয় হোক!

ধরার অর্ধ নরনারী মোরা রহি এই দুইদেশে,
কেন আমাদের এত দুর্ভোগ নিত্যদৈন্য ক্লেশে,
সহিবনা আর এই অবিচার, খুলিয়াছে আজি চোখ॥
চীন ভারতের জয় হোক! ঐক্যের জয় হোক!
সাম্যের জয় হোক!"

(শেষাংশ ১০৬৮ পৃষ্ঠায়)

মুক্তিসংগ্রামের কবি নজরুল ইসলাম

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

যে কোন পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের কাব্য-সাহিত্য বিশ্ব-সংস্কৃতির মহান সম্পদ; তা সে আরবেরই হোক, আফ্রিকারই হোক অথবা আমাদের মধু-হেম-রবীন্দ্র-নজরুল ও সুকান্তেরই হোক।

অন্য সব দেশের ঔপনিবেশিক দাসত্বের প্রথম পর্যায়ের মত আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনও পরিচালিত হয়েছে স্বদেশী ধনিক ও তাদের অনুচর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে; এই পর্যায়ের আন্দোলন সংস্কারবাদী ও আপসমুখী এবং স্বভাবতই সীমাবদ্ধ, স্ববিরোধী ও শভিনিজমের রোমান্টিক ভাবাবেগে নিষিক্ত। এরই মধ্যেকার গণমুখী ঐতিহ্যই গোটা জাতির রাজনৈতিক শক্তির সম্পদ।

সারা বিশ্বে ধনতন্ত্রের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সম্পর্ক একই সঙ্গে বৈপরীত্যের ও ঐক্যের সম্পর্ক। ধনতন্ত্রই তার বিকাশের চূড়ান্ত স্তরে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী যুগের সূচনা ও সর্বগ্রাসী ব্যাপ্তি ঘটিয়েছে; এ ক্ষেত্রে পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির মুক্তির তাগিদ ও বিকাশ বাস্তব পরিস্থিতির বৈপরীত্য থেকেই উৎসারিত হয়েছে এবং এই ধনতন্ত্রই গোটা জাতির সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতা খতম হওয়ার সুযোগ এনে ঐক্যের ও যুক্তিবাদী মানবতার রাস্তা করে দিয়েছে; তবে এ রাস্তাতেও ভাঁটার টান থেকে যায়। তাই একই সিপাই বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অথবা আফ্রিকার বোয়ার যুদ্ধ ও চীনের বকসার বিদ্রোহ সম্পর্কে বাঙালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিকোণ ও ভূমিকা দুই রকমের হয়েছে। রামমোহনের যথার্থ উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে ও যে সব ঘটনায় ব্রিটিশ শাসনের বর্বরতাকে ধিক্কার দিয়েছেন, সেই সময়ে একই ঘটনায় রক্ষণশীল বাঙালী পণ্ডিত-সমাজ ব্রিটিশ প্রভুদের বন্দনাগীত ও তাদের পক্ষে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করেছেন।

প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮), একদিকে সাম্রাজ্যবাদী পাশবিকতাকে নগ্ন করে বিশ্ব-জনগণের সামনে ভয়াল কুৎসিত চেহারায় আত্মপ্রকাশ করেছে; অপরদিকে তারই প্রতিবাদী বিকল্প শক্তিরূপে পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির শ্রমিক-কৃষক জনগণের ব্যাপক ও সচেতন অংশগ্রহণে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে এবং মহান লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ে সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের কবর রচিত হয়েছে।

আমাদের দেশের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তিসংগ্রামে আলোচ্য পটভূমি ও বিপরীতমুখী ধারা কার্যকর হয়েছে। প্রথমত, ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট ও কৃষক বিদ্রোহের ধাক্কায় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের 'গেল গেল রব' যতই সোচ্চার হয়েছে, তাদের বিশ্বাসঘাতী ক্লীব চরিত্র ততোই উন্মোচিত হয়েছে; দ্বিতীয়ত, এদেরই সহায়তায় সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক বিভেদের বিষগুলি নতুন করে খুঁচিয়ে তোলা হয়েছে; তৃতীয়ত, তীব্র অর্থনৈতিক দুর্দশা ও ব্রিটিশ সরকারের দমন-পীড়নের প্রতিবাদী শক্তি তথা জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম মেহনতি মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণে বিপ্লবী গণ-সংগ্রামের সূচনা হয়েছে এবং চতুর্থত, রুশ দেশের নভেম্বর বিপ্লব (১৯১৭)-এর প্রভাবে জাতির সংগ্রামী ইতিহাস নতুন বাঁক নিয়েছে।

এই ঐতিহাসিক পর্বে রবীন্দ্রনাথ যেমন পাশ্চাত্য 'আলোকপ্রাপ্ত'দের যুক্তিবাদী উদার গণতন্ত্র ও মানবতার আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে 'লড়ায়ের মূল', 'বাতায়নিকের পত্র', 'শিক্ষার মিলন', 'সত্যের আহ্বান' প্রভৃতি প্রবন্ধ ও 'বলাকা', 'ঝড়ের খেয়া' প্রভৃতি

কবিতা রচনা করেছেন, তেমনি অপরদিকে জমিদার-পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি মধ্যযুগীয় মতাদর্শের কংগ্রেসী নেতা গান্ধী, জার-আমলের রুশী নাগরিকদের মত, চরকা পুজো, পাশ্চাত্য শিল্প-বিজ্ঞান বর্জন ইত্যাদি রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে জালিয়ান-ওয়ালাবাগের ঘটনায় জলছড়া দিয়েছেন এবং চৌরিচোরা কৃষক বিদ্রোহ দাবিয়ে দিতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন তুলে নিয়েছেন।

এরই মধ্য থেকে চিরবিদ্রোহী নজরুলের আবির্ভাব। এক মহান ঐতিহাসিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যই তিনি একবুক সামুদ্রিক আবেগ ও সাহস নিয়ে, একই সঙ্গে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। তবে একই পর্বের আর এক ধারার ঐতিহাসিক প্রয়োজনে গান্ধীর নেতৃত্বও সক্রিয় হয়েছিল। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ধারা যে সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামে রূপান্তরিত হচ্ছে, সেই সন্ধিক্ষণে অনিবার্যভাবেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে মধ্যযুগীয় পশ্চাৎপদতায় স্থবির ও সংশোধনবাদী বিশ্বাসঘাতকতায় কুটিল গান্ধীবাদী নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল। ১৯২০-২১ সালে শ্রদ্ধেয় মুজফফর আহমদের নেতৃত্বে যখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হচ্ছে এবং ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্ট পার্টির রাজনৈতিক কর্মসূচি যখন শ্রমজীবী মানুষকে আকর্ষণ করছে, তখন নজরুল করাচী সীমান্ত থেকে (প্রথম বিশ্বযুদ্ধে) রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা ও অনুরাগ নিয়ে কলকাতায় এলেন এবং শ্রদ্ধেয় আহমদের সঙ্গে যুক্ত হলেন। এই মিলনের ফল, রাশিয়ায় গোর্কি ও লেনিনের মিলনের মত গভীর তাৎপর্যে সমৃদ্ধ হয়েছে।

নজরুল মূলত খাঁটি কবি ছিলেন বলেই প্রধানত রাজনৈতিক কবি। তাঁর রাজনৈতিক কবিসত্তা কোন বিশেষ স্তরে সীমাবদ্ধ থাকেনি; খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একটা ক্রমবিকাশমান চেতনার আলোড়ন সৃষ্টি করে গোটা যুগের জাতীয় সংগ্রামের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনকে ধারণ ও প্রকাশ করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় মুজফফর আহমদ তাঁর স্মৃতিকথায় বলছেনঃ "দেশের অবস্থা তখন খুবই গরম। তাপের উপরে চড়ালে জল যেমন টগবগ করে ফোটে, দেশের বিক্ষুব্ধ মানুষও তেমনি টগবগ করে ফুটছিল। পাঞ্জাবে যে নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড হয়েছিল সেই কথা দেশের জনসাধারণ তখনো ভোলেনি। ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার আইন দেশের লোকেরা মেনে নিতে চাইছেন না কিছুতেই। আবার বড় বড় নেতারা এই শাসন-সংস্কার কাজে লাগাতে চাইছেন। পর্বত ও সমুদ্রের বাধা কাটিয়ে রুশ দেশের মজুর শ্রেণীর বিপ্লবের খানিকটা ঢেউ এদেশেও পৌঁছেচে। মজুর শ্রেণী চঞ্চল হয়ে উঠেছে।"

নজরুলের কবি-ব্যক্তিত্বের উৎস হাফেজ-গালিবের ও যাত্রা-লেটোপাঁচালীর লোক-সংস্কৃতির ঐতিহ্য এবং রবীন্দ্র-প্রভাবের মানবতাবাদ ও সামন্তবাদ-বিরোধী ব্যক্তি-চেতনার আদর্শ; তবে যেহেতু তিনি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবেশে লালিত এবং প্রধানত 'মাটির কাছাকাছি'র কবি তাই রবীন্দ্রনাথের ভাববাদ তাঁকে ভর করেনি। প্রথম দিককার 'নবযুগ'-এর পর্বেই (১৯২০-২১) তিনি সমকালের ধর্মঘট আন্দোলন নিয়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন তাতেই দরিদ্র শ্রমজীবী জনগণ সম্পর্কে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। পরে 'ধূমকেতু'কে (১৯২২) স্বাগত জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ 'জাগিয়ে দে রে চমক মেরে/ আছে যারা অর্ধচেতন।' দেশের অপচয়িত বিভ্রান্ত যুবসমাজকে তো বটেই, সেই সঙ্গে রাজনীতির ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় ধর্ম-সংস্কারে আচ্ছন্ন অসহযোগীদের এবং কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাবপ্রবণ জাতীয়তাবাদ, মধ্যবিত্তসুলভ পল্লীপ্রাণতা, গার্হস্থ্য রসের মগ্নতা, পরিবর্তন-বিমুখতা, দেহবাদ, প্রাদেশিকতা এবং দুঃখবাদ ইত্যাদিতে আচ্ছন্ন কবি-সাহিত্যিকদেরও নাড়া দিয়ে জাগানোর আহ্বান জানালেন। জানালেন সেই 'ধূমকেতু'র কবিকে যার সঙ্গে তখনকার রক্ষণশীল ও 'মাথাওয়ালা' মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজ তাঁকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল।

এই 'ধূমকেতু' পর্বের কাব্যগুলিতে নজরুল যে রাজনৈতিক সত্তাকে জাগিয়েছেন, স্বরাজী বা ডোমিনিয়ান স্টেটাসের জিগির বর্জন করে যে পূর্ণ স্বাধীনতার শ্লোগান তুলেছেন, যে 'বিদ্রোহী'কে উদ্দীপিত করে 'ভাঙার গান' ও 'বন্দীর বন্দনা' গেয়েছেন, তা কোন ভাবপ্রবণ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ নয়; তা হল, অতীতের নস্টালজিক স্মৃতি ও মধ্যযুগীয় গুরুবাদী মোহ-বর্জিত র‍্যাশনাল মানবতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের লাভাস্রোত। এই সময়েই তিনি সনাতন দেববাদী ধ্যান-ধারণার প্রাচীরে সজোরে আঘাত করে রাজনৈতিক মাতৃ-বন্দনা 'আনন্দময়ীর আগমনে' রচনা করে ব্রিটিশ শাসকের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। সুভাষচন্দ্র তাঁর 'ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' বইতে লিখেছেনঃ "During 1922 conflicts between political prisoners and the prison authorities took place in many prisons in India. Matters came to a head in two prisoners in Bengal—at Barisal and Faridpur. Political prisoners demanded decent treatment at the hands of of the authorities and refused to submit to the humiliating treatment meted out to prisoners in Indian Jails." নজরুল কাব্যের রণধ্বনি তুলে যেমন হাজার হাজার যুবক ও শ্রমিকের সঙ্গে জেলে গেলেন, তেমনি সেই কাব্যের হাতিয়ারেই, নৈরাশ্যের বিরুদ্ধে তো বটেই, সেইসঙ্গে মানবিক অধিকারের সপক্ষে কাব্য-সংগীতের দামামা বাজিয়ে আকাশ-মাটি মুখরিত করে তুললেনঃ 'বন্দীশালা মাঝে ঝঞ্ঝা পশেছে রে।' তাঁর 'বিদ্রোহী' কোন ব্যক্তিগত নৈরাজ্যবাদ নয়; সব রকম রাজনৈতিক ও সামন্ততান্ত্রিক জোয়ালের বিরুদ্ধে সমকালীন যৌবনশক্তির অগ্ন্যুৎপাত, যা শেলীর প্রমেথিউসের মত আপসহীন, সুতীব্র ও দুর্বার; তবে তাঁর 'ভাঙার গান' কেবল ভাঙারই গান নয়; তাঁর নিজের ভাষায়ঃ 'নতুন করে গড়তে চাই বলেই তো ভাঙি—শুধু ভাঙার জন্যই ভাঙার গান আমার নয়।......আমার বিদ্রোহে যে আনন্দের অভিব্যক্তি তা সর্ববন্ধন মুক্তির—পূর্ণতর স্রষ্টার।' এই বিপ্লবী আবেগ থেকেই তাঁর 'প্রলয়োল্লাস' কবিতার সৃষ্টি। রুশ দেশের নভেম্বর বিপ্লবকে স্বদেশেও স্বাগত জানিয়ে মুক্তিমন্ত্রের চারণ গাইলেনঃ 'ওই

নূতনের কেতন ওড়ে/কাল-বোশেখীর ঝড়/তোরা সব জয়ধ্বনি কর।' তাঁর সিন্ধু পারের 'আগল ভাঙা' হল রুশ বিপ্লব; তার প্রলয় মানে বিপ্লব এবং নজরুলের 'নূতনের কেতন' উড়ানোর আহ্বান হল আমাদের দেশেরও সমাজ-বিপ্লব। এই বিপ্লব সেদিন সফল হবে যেদিন 'উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না', সেই 'পূর্ণ স্বাধীন' রাষ্ট্র কখনই ধামা-ধরা মরণভীতু আপসকামীদের রাজনীতির পথে আসতে পারে না। তবে কোন্ সে পথ? কবি শেষে তাঁর প্রিয় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পথেও তাঁর স্বপ্নের রাষ্ট্র দেখেননি; নিজেই তাঁর 'বর্তমান বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধে বলেছেন: "যারা ধ্বংসব্রতী, তারা ভৃগুর মত বিদ্রোহী। তাঁরা বলেন—এ দুঃখ এ বেদনার একটা কিনারা হোক। এর রিফর্ম হবে ইভোলিউশন দিয়ে নয়, একেবারে রক্ত-মাখা রিভোলিশন দিয়ে। এর খোল নলচে দুই বদলে একেবারে নতুন করে সৃষ্টি করব।......দূর সিন্ধুতীরে বসে ঋষি কাল মার্কস যে মারণমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, তা এতদিনে তক্ষকের বেশে এসে প্রাসাদের লুক্কায়িত শত্রুকে দংশন করলে। জার গেল, জারের রাজ্য গেল। ধনতান্ত্রিকের প্রাসাদ হাতুড়ি-শাবলের ঘায়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।......পাথরের স্তূপ সুন্দর তাজমহলে পরিণত হয়েছে।"

তাই থামা নেই; ক্লান্তি-নৈরাশ্য নেই। চিরবিদ্রোহী কবি ১৯২৫-২৬ সালে 'লেবার স্বরাজ পার্টি অব ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'-এর অগ্রণী সৈনিক হয়ে নামলেন, হাতে নিয়ে মুখপত্র 'লাঙল'। মৈমনসিংহ জেলা কৃষক সম্মেলনে বাণী পাঠালেন: "এত ভালবাসায় ভেজা যাদের মাটি, এত বুকের খুনে উর্বর শষ্য শ্যামল মাঠ—আপনারা কৃষাণ ভাইরা ছাড়া তাহার অন্য অধিকারী কেহ নাই......এই মাঠকে জিজ্ঞাসা কর—মাঠে ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে এ মাঠ চাষীর, এ ফুল-ফল কৃষক বধূর।" এই সময়েই সৃষ্টি করলেন 'কৃষকের গান'—'আজ জাগরে কিষাণ সব তো গেছে/কিসের বা আর ভয়/এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার/ক্ষুধার জগৎ জয়।' তাঁর 'সাম্যবাদী' ও 'সব্যসাচী' কবিতার মধ্যেও বিপ্লবী সংগ্রামের পথে সমাজবদলের নির্দেশ রাখলেন। কিন্তু শ্রমিকের গান নইলে তো কৃষকের সংগ্রাম সফল হতে পারে না! শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামী ঐক্যের মজবুত ভিৎ নইলে তো ছুৎ-অছুৎ, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ভেদ ঘোচে না! তাই 'লাঙল' রূপান্তরিত হল 'গণবাণী'তে, গড়ে উঠল 'বঙ্গীয় শ্রমিক ও কৃষক দল'। 'ধ্বংসপথের যাত্রী' শ্রমিক শ্রেণীকে আহ্বান জানিয়ে বললেন:

'এইবারে শেষ কপাল ঠুকে
পড়ব রুখে অত্যাচারীর বুকে রে
আবার নূতন গর্জাবে ভাই
আবার দেশে দল মাদল !!
ওভাই আমাদেরই শক্তি বলে
পাহাড় টলে তুষার গলে
মরুভূমে সোনার ফসল ফলে রে।'

এইভাবে নজরুল শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রী সাধন করে গোটা জাতির মুক্তি সংগ্রামের হাতে রক্তপতাকা (রক্ত পতাকার গান), ও কণ্ঠে শ্রমিকশ্রেণীর 'আন্তর্জাতিক সংগীত' তুলে দিলেন।

পরাধীনতা ও শোষণ-নিপীড়নের শিকল পরেই বিপ্লবী চারণ কবি শিকল ভাঙার রক্তক্ত শপথ নিয়েছিলেন। এরই দায়ে ব্রিটিশ শাসক তাঁর 'বিষের বাঁশী' 'ভাঙার গান', 'প্রলয়শিখা', 'চন্দ্রবিন্দু' ও 'যুগবাণী'—এই পাঁচখানি বই বাজেয়াপ্ত করেছিল। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে তাঁর কাব্যের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল এমনই।

নজরুল কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা চাননি; গোটা সমাজকেই বদলাতে চেয়েছিলেন। আজ তিরিশ বছর দেশ স্বাধীন হয়েছে; কিন্তু গোটা জাতির মেহনতকারী মানুষ দুর্দশার জগদ্দল পাথর থেকে আজও মুক্তি অর্জন করতে পারেননি। কিন্তু সচেতন হয়েছেন অনেক; সংগ্রামী পদক্ষেপে একের পর এক মাইলস্টোন পারও হচ্ছেন, যেমন করে চল্লিশের দশকের মুখে দুরারোগ্য ব্যাধিতে মৌন হবার মুখে নজরুল তাঁর সংগ্রামের 'শিখা' জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন কবি সুকান্তের বিপ্লবী চেতনায়।

ভারতীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও নজরুল

(১০৫৬ পৃষ্ঠার পর)

কুসুম"। সুতরাং তিনি যে পূর্বোক্ত কোরাস গানে হিন্দু মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক জাতি-চিহ্নের ঔচিত্যে প্রশ্ন তুলবেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতে কবির "জাতের নামে বজ্জাতি" কবিতাটিকে ("জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছ জুয়া/ছুঁলেই তোর জাত যাবে, জাত ছেলের হাতের নয়ত মোয়া।......" ইত্যাদি) যদি আমরা বিচার করি তাহলে তার প্রচলিত অর্থ ছাড়াও তার মধ্যে নতুন অর্থের উদ্‌বোধনা আমরা লক্ষ্য করব।

গদ্যরচনা

গদ্যরচনাতেও নজরুল জাতীয়তার ভাবটিকে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন নানা লেখার মাধ্যমে বিধিবদ্ধভাবে। প্রথম যুগের সান্ধ্য 'নবযুগ' পত্রিকার একাধিক সম্পাদকীয় নিবন্ধ পরবর্তী পর্যায়ের দৈনিক নবযুগের সম্পাদকীয় সমেত বিবিধ রচনা এবং তাঁর অন্যান্য কতিপয় গদ্যগ্রন্থ (তার মধ্যে উপন্যাসও রয়েছে) এ কথার প্রমাণ। নবযুগের সম্পাদকীয়গুলিতে আবেগের উদ্দীপনা এত বেশী এবং সেসব এমনি ঘরোয়া ভাষায় রচিত যে, সেগুলির সুরের সঙ্গে এই শতকের প্রথম দিক্‌কার পত্রিকা ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সন্ধ্যা'-র সম্পাদকীয়গুলির একটা প্রকৃতিগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মিল ভাব ও ভাষায় উভয়ত। দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি:

"বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা
ঘরশত্রু বিভীষণ"

"বোম্বাই প্রাদেশিক কমিটির মোট ৬০ জন সদস্যের মধ্যে ৪০ জন নাকি গোয়েন্দা বিভাগের চর বলে ধরা পড়েছে। যে ঘরশত্রু বিভীষণের দল মাকে পরের হাতে সঁপে দেয় তাদের জন্য মা রুদ্রকালীর রক্ত খড়্গ আস্ফালন করে উঠুক। এই মাতৃ-দ্রোহী স্বার্থান্ধ পিশাচদের মুখ শুয়োরের মত জঘন্য হয়ে যাক, বিশ্বের নর-নারীর থুথু তাদের মুখে পড়ুক। যে-ইংরেজ বিদ্রোহী আইরিশ তরুণ রবার্ট এমেটকে ফাঁসী দিয়ে মেরে তার শব তিন খণ্ড করে কেটে রাস্তার মোড়ে মোড়ে টাঙিয়ে রেখে-ছিল আর বলেছিল 'দেখ কেমন করে দেশদ্রোহীর প্রতি ব্যবহার করতে হয়, সেই ব্রিটিশ সিংহ এইসব মাদি টিকটিকিদের সম্বন্ধে কী বলেন ?"

আর একটি উদ্ধৃতি:

"ওরে পতিত ওরে লাঞ্ছিত, তুই দেখ সারা বিশ্ব তোকে ধ্বংস করতে উদ্যত। দেবতা তাঁর জল ঝড় নিয়ে, প্রকৃতি তার রোগ মহামারী নিয়ে তোকে পিষে ফেলতে ব্যস্ত। আবার তার জগদ্দল পাথর তোর বুকে বসিয়ে দিয়েছে—সমাজ তোর কণ্ঠ রোধ করে ফেলেছে। ধনীর অট্টহাস্য তোর প্রাণের করুণ কাঁদুনী ঢেকেছে।"

বেশ বোঝা যায় সাধারণের বোধ্য ভাষায় সাধারণের মনোভাব প্রকাশক ভঙ্গিমায় এই প্রবন্ধগুলির সংরচন। প্রতিটি বাক্য আবেগে মথিত। সুতরাং প্রত্যাশিত ভাবে লেখাগুলি সেই সময়ে খুবই সাড়া জাগিয়েছিল। তবে গদ্যের তুলনায় নজরুলের কাব্যের আবেদন অনেক বেশী গভীর—এ বিষয়ে কোন মহলেই কোন মতভেদ নেই। ছন্দ ও মিল মানুষের মনে যে জাদু সৃষ্টি করতে পারে তা কি গদ্যের পক্ষে কখনও সম্ভব ?

গণসংগীতের পথিকৃৎ

(১০৬৪ পৃষ্ঠার পর)

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলায় গণসঙ্গীতের প্রথম সূচনা করেছিলেন। তাঁর এই গণসঙ্গীত কথায়, ছন্দে, সুরে অভিনব এবং বৈচিত্র্যময়। কোন গানে শুদ্ধ রাগ ব্যবহৃত হয়েছে, কোথাও রাগের সঙ্গে লোকসঙ্গীতের সুরের অপূর্ব মিলন ঘটেছে, কোথাও পাশ্চাত্যের জঙ্গী গানের সুর। যে সুর ভারতীয় পরি-বেশে কথায় ও ছন্দে এক নতুন রূপ গ্রহণ করেছে। এই প্রবন্ধে আমি কয়েকটি মাত্র গণসঙ্গীতের উল্লেখ করেছি। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আরো বহু গান রয়েছে, যেগুলির প্রথম কলির একটা তালিকা দেওয়া গেলে পাঠকদের সুবিধা হত। কিন্তু স্থান সঙ্কুলানের কথা বিবেচনা করে তা দিলাম না। কাজী নজরুলের প্রেমের ও ভক্তির গান আজকাল শিল্পীরা যত গান, গণসঙ্গীতের চর্চা তেমন করেন না। কিন্তু তাঁর গণসঙ্গীতের সুরগুলি ধরে রাখার প্রয়োজন আছে আমাদের সঙ্গীত জগতের স্বার্থে। নজরুলের গণসঙ্গীত আমাদের সমবেত সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। এই অতুলনীয় গানগুলি রেডিওতে তখনই শোনা যায় দেশ যখন বিপদের সম্মুখীন হয়, অথবা মানুষকে দেশাত্ম-বোধে জাগাবার প্রয়োজন হয়। তখন নজরুল গানের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। নজরুলের গণসঙ্গীত নির্যাতিতের প্রতি সমবেদনা ও জেগে ওঠার আহ্বান, নজরুলের গণসঙ্গীত অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান। নজরুলের গণসঙ্গীতে রয়েছে নতুন যুগের আগমন বার্তা, ঐক্যবদ্ধ শক্তি ও মানুষের প্রতি বিশ্বাস। এই গান তাই কথায়, সুরে ও তালে মানুষকে উৎসাহিত করে, অনুপ্রাণিত করে।

নজরুলের ব্যঙ্গকবিতা

নির্মলদাশ

॥ এক ॥

আমি চাইনে হতে ভ্যাবাগঙ্গারাম,
ও দাদা শ্যাম!
তাই গান গাই আর যাই নেচে যাই
ঝম্‌ঝমাঝম্‌ অবিশ্রাম ॥
আমি সাইক্লোন আর তুফান
আমি দামোদরের বান
খোশখেয়ালে উড়াই ঢাকা, ডুবাই বর্ধমান।
আর শিবঠাকুরকে কাঠি করে বাজাই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ড্রাম ॥

নজরুল কবে কোন্ উপলক্ষে এই কবিতাটি লিখেছিলেন জানি না, তবে এটি যে বড়ো স্বচ্ছ ও অমোঘ রচনা তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এর মধ্যে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ ও কবিস্বভাবের মূল অংশটাই বেশ স্পষ্ট করে ফুটে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে নজরুল যখন স্থায়ী-ভাবে বাংলা কবিতার আসরে অবতীর্ণ হলেন তখন বাংলা কাব্যের দিঙ্-মণ্ডলে ললিত রোম্যান্টিসিজ্‌মের সুরম্য বাতাবরণ বিরাজ করছে। তারই মধ্যে কেউ কেউ রোম্যান্টিসিজ্‌মের বন্ধনকাতর অনুপ্রেরণায় মাঝে মাঝে প্রচলিত জীবনের গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু বড়ো শৌখিন সেই বিক্ষোভ, বড়ো আনুষ্ঠানিক সেই সংরাগ। কারণ বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার যোগ খুবই কম। বস্তুত এটাই স্বাভাবিক ছিল, কারণ বাঙালী রোমান্টিক কবিরা বাস্তব জীবনে প্রায় সকলেই ছিলেন মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী বা মধ্যবিত্ত ভূমি-স্বত্বভোগী। ফলে কবিতায় তাঁরা যে মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন বা দেখা-তেন বাস্তব জীবনে তার অবিকল প্রতিচ্ছবি তাঁরা দেখতেন না বা দেখতে চাইতেন না। এই জন্য বাংলা গড়পড়তা রোম্যান্টিক কবিতায় যে মুক্তির স্বপ্ন পাওয়া যায় তা নিতান্তই আনুষ্ঠানিক। তবে ব্যতি-ক্রম নিশ্চয়ই আছে এবং তা রবীন্দ্ররচনায়। কারণ রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত-ভাবে ভূমিস্বত্বভোগী হলেও মানসিকতায় শোষণপ্রবণ জমিদার কিংবা আপসপন্থী মধ্যবিত্ত নন এবং সবচেয়ে তাঁর বড়ো কথা, স্বপ্ন সত্যেরই বর্ণিল প্রতিচ্ছবি। পক্ষান্তরে অন্য কবিরা প্রায়শই মধ্যবিত্ত —জীবনধারণে ও জীবনধারণায়। এই মধ্যবিত্ত কবিরা বহির্জীবনে বিদ্রোহ, বিপ্লব, বিক্ষোভ ইত্যাদি অশান্তিকর পরিস্থিতির সম্ভাবনা এড়িয়ে নিরাপদ অন্তর্জীবনে এইসব পরিস্থিতির সুদূর স্বপ্ন-দর্শন করেছেন। এইজন্য তদানীন্তন বাংলা কবিতায় দেখা গিয়েছে বহির্জীবনবিচ্যুত নিভৃত অন্তর্মুখিতা, যার অন্য অর্থ জীবন ও শিল্পের পারস্পরিক অসামঞ্জস্য। এদিক থেকে রবীন্দ্রেতর রোম্যান্টিক কবিসমাজে সম্ভবত নজরুলই সবচেয়ে সৎ ও আন্তরিক কবিব্যক্তিত্ব। কারণ তাঁর জীবনধারণ ও জীবনধারণায় কোন অসামঞ্জস্য ছিল না। রোম্যান্টিসিজ্‌মের প্রেরণায় তিনি কবিতায় যে বেপরোয়া ও বেহিসেবী জীবনাদর্শ প্রচার করেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত বহির্জীবনেও সেই একই বেপরোয়া ও বেহিসেবী মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে তাঁর রচনায় অন্তর্মুখিতার সঙ্গে আর একটি জিনিস দেখা দিল, তা হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সমান্তরাল ধারায় তাঁর কাব্যিক ভাব্য-বেগের বহির্মুখী বিস্ফোরণ। এই জীবন-উত্থিত বহির্মুখী বিস্ফোরণ বাংলা কাব্যে নজরুলের নিজস্ব সংযোজন। এই বিস্ফোরণপ্রবণতাই নজরুলের কবিব্যক্তিত্বকে ঝটিকাসংকুল ও বিদ্রোহীরূপে চিহ্নিত করেছে। এই বিস্ফোরণপ্রবণতাই নজরুলের অস্তিত্বকে ঢাকা থেকে বর্ধমান তথা বাংলার পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রত্যন্ত পর্যন্ত অবিস্মরণীয়ভাবে জাগিয়ে রেখেছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে : কবির এই বিস্ফোরণের উৎস কী? সাহিত্যে এই বিস্ফোরণের পরিণামই বা কী? এই বিস্ফোরণের উৎস হচ্ছে তাঁর অন্তর্নিহিত জীবনশক্তি, যা সাইক্লোন, বন্যা বা অন্য যে কোন প্রাকৃতিক শক্তির মতই বেপরোয়া, বেহিসেবী ও পক্ষপাতশূন্য। এই জীবনশক্তি তাঁর কবিতায় আত্মপ্রকাশের সহজ আবেগে ছুটে বেরিয়ে পড়তে চেয়েছে—এই বেরিয়ে পড়ার মুহূর্তে যখন সে কোন বাধা পায় নি তখন তার বহিঃপ্রকাশ ধরা পড়েছে 'বিদ্রোহী', 'সাম্যবাদী' প্রভৃতি রচনার মতো আরো অনেক অনর্গল পদ্যবন্ধে, যা দেখতে কবিতার মতো হলেও স্বাদে আবেগধর্মী প্রবন্ধের মতো। কিন্তু বহির্জীবনের কোন বিকার বা বিপর্যয়—তা সামাজিক বা রাজনৈতিক যা-ই হোক্ না কেন—যখন ঐ জীবনশক্তিকে আঘাত করেছে তখন সেই আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় কবির কণ্ঠস্বরে জেগে উঠেছে অকুতোভয় প্রত্যাঘাতের উতরোল প্রতিধ্বনি—সাহিত্যের সংসারে যার পারিভাষিক নাম ব্যঙ্গ! সুতরাং নজরুল সাধারণত অনর্গল ও সরলরেখা, কিন্তু আহত হলেই তির্যক ও ব্যঙ্গকুটিল।

॥ দুই ॥

প্রকৃতপক্ষে দেশ-কাল-সমাজের নানা দুর্গতিই কবির অবাধ জীবনশক্তিকে বারংবার পীড়িত করেছে এবং তাঁর সরলরেখা বিস্ফো-রণের গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে তাঁকে তির্যক ও ব্যঙ্গকুটিল হতে বাধ্য করেছে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি যে সুস্থ, সবল ও উদ্দীপনাময় মুক্ত জীবনের পক্ষপাতী, তাঁর চারপাশের স্বজাতি বাঙালীসমাজে তার অভাব তাঁকে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ করেছিল। ইংরেজের ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় এ দেশে ইংরেজের স্বার্থরক্ষক যে মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছিল তার অপদার্থতার প্রতি উনিশ শতক থেকেই বঙ্কিম, ইন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্যিক ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করে এসেছেন, কিন্তু তাতেও এই শ্রেণীচরিত্রের কোন পরিবর্তন হয় নি। মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের এই অপরিবর্তমান মেরুদণ্ডহীনতার প্রতি ধিক্কার জানিয়ে নজরুল তাই লিখলেন :

নখদন্তবিহীন চাকুরী-অধীন আমরা বাঙালী বাবু
পায়ে গোদ, গায়ে ম্যালেরিয়া
বুকে কাসি লয়ে সদা কাবু ॥
ঢিলে-ঢালা কাছা কোঁচা সামলায়ে
ভুঁড়ি বয়ে ছুটি নিট্‌পিটে পায়ে,
আপিসে কাসিয়া কলম পিশিয়া,
ঘরে এসে খাই সাবু ॥...
এগ্‌জামিনের লাঠি ধরে ধরে
দাঁড়াই আসিয়া আফিসের দোরে,
মাইনে যা পাই তাই দিয়ে খাই
কলমী আর অলাবু ॥ [বাঙালীবাবু]

সমাজের পুরুষেরা যেখানে মেরুদণ্ডহীন, সেখানকার পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের অবস্থা আরও শোচনীয় :

এ দেশের নারী বেজায় আনাড়ী
পুরুষের হাতে তবলা,
তবলাতে চাঁটি মারিলে সে কাঁদে
ইহারা কাঁদে না, অবলা।
জরী শাড়ী-মোড়া চকোলেটে ওরা
বন্দী হেরেম-বাক্সে,
বাহির করিলে খেয়ে নেবে কেউ,
কাজেই বাক্সে থাক্‌ সে ॥
[সাইমন কমিশনের রিপোর্ট]

মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের অপদার্থতাকে বঙ্কিম, ইন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ সাহিত্যিকেরা যে ব্যঙ্গ করেছিলেন, সেক্ষেত্রে বাঙালী সমাজের আত্মিক অবক্ষয়ই তাঁদের ব্যঙ্গোচ্ছ্বাসকে উদ্দীপিত করেছিল। কিন্তু নজরুলের উত্তেজিত হবার কারণ কিছুটা ভিন্ন। তিনি শুধু বাঙালী সমাজের আত্মিক অবক্ষয়ই লক্ষ্য করেন নি, এর মধ্যে তিনি বাঙালী সমাজে বিজাতীয় অপসংস্কৃতির অশুভ বিস্তার ও পরিণামে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার সুগভীর ষড়যন্ত্র লক্ষ্য করেছিলেন :

চোখের চাইতে চশমাই বেশী,
ভাগ্যিস ওরা অন্ধ,
নৈলে কখন টানিয়া ধরিত
আমাদের গলাবন্ধ ॥
আমাদের দেখাদেখি কেহ কেহ
করিছে ক্লাবের মেম্‌-বার,
স্কার্ট পরে চাষীরা, বাবুরা
বিবি লয়ে যায় চেম্বার।
বিলিতি দাওয়াই ধরিতেছে ক্রমে,
আর বাকী নাই বেশী দিন,
গড় বয় হয়ে গিলিছে আফিম,
হুইস্কি, ব্রাণ্ডি, কুইনিন ॥...
চাচা-ভাইপোতে মিল নাই সেথা
আড়াআড়ি টিকি-দাড়িতে,
যুদ্ধ বাধাই উহাদেরি দিয়ে
ধরিয়া আনাই ফাঁড়িতে ॥
[সাইমন কমিশনের রিপোর্ট]

হিন্দু-মুসলমানের মিলিত অস্তিত্বে কয়েক শতাব্দী ধরে যে অখণ্ড বাঙালী সমাজ গড়ে উঠেছে, ইংরেজ তার প্রশাসনিক সুবিধার জন্য নানা অজুহাতে তাতে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করেছে। ইংরেজের এই অপচেষ্টা ও এই অপচেষ্টা সম্পর্কে বাঙালীর নির্বোধ ঔদাসীন্য কবিকে দুঃখ দিয়েছিল, তাই এই সাম্প্রদায়িক বিভেদপ্রবণতা সমগ্র বাঙালী জাতির পক্ষে কতখানি অসংগত ও আত্মঘাতী তা নানা গানে ও কবিতায় নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। যেমন :

আবু আর হাবু দুই ভায়ে ভায়ে সদাই ভীষণ দ্বন্দ্ব।
বোঝালে বোঝে না, এক ভাই কানা আর এক ভাই অন্ধ ॥
হাবু বলে, 'আবু, বিশ্রী দেখায় শীগ্‌গির চাঁচ দাড়ি।'
আবু বলে, 'দাদা, পেঁয়াজের ঝাড় ঐ টিকি কাট্‌ তাড়াতাড়ি'।
টিকি ও দাড়িতে চুলোচুলি বাধে ট্রাম বাস হয় বন্ধ ॥

এই সময়ে কোন কোন দেশনেতা রাজনৈতিক প্রয়োজনে হিন্দুমুসলমানের মিলনচুক্তির কথা ঘোষণা করেছিলেন ; কিন্তু যে মিলন শুধু চুক্তি-নির্ভর এবং যে মিলনের কোন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি নেই তার ফল যে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না নজরুল তা সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন :

বদ্‌না-গাড়ুতে গলাগলি করে, নব প্যাক্‌টের আস্‌নাই,
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই ॥
আঁটসাঁট ক'রে গাঁটছড়া বাঁধা হল টিকি আর দাড়িতে,
বজ্র আঁটুনী ফস্‌কা গেরো? তা হয় হোক তাড়াতাড়িতে!
একজন যেতে চাহিবে সমুখে, অন্যে টানিবে পিছনে,
ফস্‌কা সে গাঁট হয়ে যাবে আঁট সেই টানাটানি ভীষণে ॥

সারা-রারা-রারা সহসা অদূরে উঠিল হোরির হর্‌রা
শম্ভু ছুটিল বম্বু তুলিয়া, ছকু মিঞা নিল ছোর্‌রা।
লাগিল হাঁচ্‌কা হেঁইয়ো, হাঁইয়ো টিকি দাড়ি ওড়ে শূন্যে,
ধর্মে ধর্মে করে কোলাকুলি আহা প্যাক্‌টেরি পুণ্যে!
বদ্‌না-গাড়ুতে পুনঃ ঠোকাঠুকি রোল উঠিল 'হা হন্ত'।
ঊর্ধ্বে থাকিয়া সিঙ্গী মাতুল হাসে ছিরকুটি' দন্ত।
মস্‌জিদ পানে ছুটিলেন মিঞা, মন্দির পানে হিন্দু,
আকাশে উঠিল চির-জিজ্ঞাসা—করুণ চন্দ্র-বিন্দু। [প্যাক্ট]

হিন্দু-মুসলমানের এই সাম্প্রদায়িক সমস্যা কবিকে এত বিচলিত করেছিল যে কবি কখনো কখনো তির্যক ব্যঙ্গের পথ ছেড়ে সরাসরি কঠিন বিদ্রূপ ও কঠোর তিরস্কারে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছেন :

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতে নয় ত মোয়া॥
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতির জান,
তাইত বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে একশ' খান।
এখন দেখিস ভারত-জোড়া
পচে আছিস বাসি-মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া ॥
[জাতের বজ্জাতি]

শুধু সাম্প্রদায়িক ব্যাপারেই নয়, দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনেও দেশনেতাদের অদূরদর্শিতা, অসংগত ভিক্ষুক মনোবৃত্তি ও আপসপ্রবণ নরমপন্থা তাঁকে অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। তখন কোন কোন বর্ষীয়ান

দেশনেতার ধারণা ছিল আলাপ-আলোচনা ও অহিংস আন্দোলনের দ্বারা ইংরেজের কাছ থেকে যতটা স্বাধিকার আদায় করা যায়, ততটাই লাভ। কিন্তু এইসব আলাপ-আলোচনা বা অনুনয়-বিনয়ে কবি আস্থা হারিয়েছিলেন। গোল-টেবিল বৈঠককে ব্যঙ্গ করে তাই লিখলেন :

চলছে নরম গরম চাঁই
হোমরা চোমরা ওমরা যায়।
বলছে ডেকে 'দেখরে দেখ,
প্রতাপ চলে চৈতকে
ডিম-গোলাকার গোল টেবিল
করবে সার্ভ অশ্ব-ডিম,
তা দিবে তায় ধাড়ির দল
তা নয় দিলে ততঃ কিম্।
আনবে স্বরাজ ব্রিটিশ-বর্ন
অস্ট্রেলিয়ার ভাইপোকে।
[রাউন্ড-টেবিল-কন্‌ফারেন্স]

'ডোমিনিয়ন স্টেটাস'-এ লিখলেন :

বগল বাজা দুলিয়ে মাজা
বসে কেন অমনি রে!
ছেঁড়া ঢোলে লাগাও চাঁটি,
মা হবেন আজ ডোমনী রে।
রাজা শুধুই রাজাই রবেন।
পগার পারে নির্বাসন
রাজ্য নেবে দুভাই মিলে
দুর্যোধন আর দুঃশাসন।
ঠুঁটো হলেও হাত পেলি ত
ছিলি যে একদম বেহাত!
একেবারেই ঠ্যাং ছিল না,
পেলি ত এক ঠ্যাং নেহাৎ।
ভিক্ষের চাল কাঁড়াই হোক—আর
আঁকাড়া—তাই ঝোলায় ভর।
ওই চিবিয়ে জল খেয়ে থাক!
ফেনও পাবি অতঃপর ॥

বর্ষীয়ান দেশনেতাদের এই আত্মতৃপ্ত রাজনীতিকে তাঁর এক ধরনের আত্মবঞ্চনা ও মিথ্যাচার বলেই মনে হয়েছিল। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে তাই লিখেছিলেন :

দোহাই তোদের! এবার তোরা সত্যি করে সত্য বল!
ঢের দেখালি ঢাক ঢাক আর গুড় গুড়, ঢের মিথ্যা ছল।
এবার তোরা সত্য বল!...

বুকের ভিতর ছ-পাই ন-পাই, মুখে বলিস স্বরাজ চাই,
স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্চে দরাজ তাই!
'ভারত হবে ভারতবাসী'র—এই কথাটাও বলতে ভয়!
সেই বুড়োদের বলিস্ নেতা—তাদের কথায় চলতে হয়!'
[বিদ্রোহীর বাণী]

কবি জানতেন, ইংরেজ মুখে যাই বলুক না কেন, সে তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ভারতবাসীকে কখনোই পূর্ণ স্বাধীনতা দেবে না। কাজেই পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে ভিক্ষাবৃত্তি নয়, যুদ্ধ করতে হবে :

ধর্মকথা প্রেমের বাণী জানি মহান্ উচ্চ খুব,
কিন্তু সাপের দাঁত না ভেঙে মন্ত্র ঝাড়ে যে বেকুব!
'ব্যাঘ্র সাহেব, হিংসে ছাড়, পড়বে এসে বেদান্ত!'
কয় যদি ছাগ, লাফ দিয়ে বাঘ অমনি হবে কৃতান্ত!
থাকতে বাঘের দন্ত-নখ
বিফল ভাই ঐ প্রেম-সেবক।
চোখের জলে ডুবলে গর্ব শার্দুলও হয় বেদপাঠক,
প্রেম মানে না খুন-খাদক।
ধর্মগুরু ধর্ম শোনান, পুরুষ ছেলে যুদ্ধে চল্!
সেও ভি আচ্ছা, মরব পিয়ে মৃত্যুশোণিত এল্‌কোহল্!
এবার তোরা সত্য বল্ ॥
[বিদ্রোহীর বাণী]

নজরুলের এই স্পষ্টবাদিতা ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বান ইংরেজ সরকার ভালো চোখে দেখে নি। তারা তাঁর ক্রিয়াকলাপ ও সাহিত্য-চর্চার ওপর কড়া নজর রাখত। নজরুল তাই ঠাট্টা করে লিখেছিলেন:

বন্ধু! তোমরা দিলেনাক দাম,
রাজ সরকার রেখেছেন মান!

যাহা কিছু লিখি অমূল্য বলে অ-মূল্যে নেন। আর কিছু
শুনেছ কি, হুঁ হুঁ, ফিরিছে রাজার প্রহরী সদাই কার পিছু?
[আমার কৈফিয়ৎ]

এবং রাজদ্রোহের অপরাধে একদিন তিনি সত্য সত্যই কারারুদ্ধ হলেন। কিন্তু জেলের জুলুম তাঁর জীবনশক্তিকে দমন করতে পারল না। হুগলী জেলের 'মূর্তিমান জুলুম বড়কর্তা'কে বিদ্রূপ করে তিনি লিখলেন একটি সুতীব্র প্যারোডি :

তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমার এ গান তোমারই ধ্যান তুমি ধন্য ধন্য হে ॥
রেখেছ শান্ত্রী পাহারা দোরে
আঁধার কক্ষে জামাই আদরে
বেঁধেছ শিকল প্রণয়ডোরে।
তুমি ধন্য ধন্য হে ॥

আ-কাঁড়া চালের অন্ন লবণ
করেছ আমার রসনা-লোভন,
বুড়ো ডাঁটা ঘাঁটা লাপ্‌সী শোভন
তুমি ধন্য ধন্য হে ॥
[সুপার বন্দনা]

নজরুলের ব্যঙ্গ মূলত সামাজিক ও রাজনৈতিক অসংগতির প্রতি বর্ষিত হলেও জীবনের অন্য অসংগতিতেও তিনি সমান ব্যঙ্গমুখর। যেমন, কলাকৈবল্যবাদী সমালোচকের প্রতি তাঁর অম্লমধুর মন্তব্য:

ঐ শোনো আজ ঘরে ঘরে কত উঠিতেছে হাহাকার,
ভূধর-প্রমাণ উদরে তোমার এবার পড়িবে মার!
তোমার আর্টের বাঁশরীর সুরে মুগ্ধ হবে না এরা,
প্রয়োজন-বাঁশে তোমার আর্টের আটচালা হবে নেড়া!
প্রেমও আছে সখা, যুদ্ধও আছে, বিশ্ব এমনি ঠাঁই,
ভালো নাহি লাগে, ভালো ছেলে হয়ে ছেড়ে যাও মানা নাই!
[সাবধানী ঘণ্টা]

কিংবা গদ্যচ্ছন্দে লেখা আধুনিক কবিতার ভঙ্গিপ্রধান ভাবদীনতার প্রতি কবির সকৌতুক কটাক্ষ ঃ

মিলের খিল খুলে গেছে!
কিলবিল করছিল, কাঁচুমাচু হয়ে ছিল
কেঁচোর মত—

পেটে পাঁকে কথার কাতুকুতু!
কথা কি 'কথক' নাচ নাচবে
চৌতালে ধামারে?
তালতলা দিয়ে যেতে হলে
কথাকে যেতে হয় কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে
তালের বাধাকে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে!
এই যাঃ! মিল হয়ে গেল!
ও তাল-তলার কেরদানী—দুত্তোর!

[কবির মুক্তি]

॥ তিন ॥

পরিশেষে আর একটি কথা—সেটা তাঁর ব্যঙ্গের শিল্পরূপ সম্পর্কে। কোন সমালোচক বলেছেন ঃ You cannot be a satirist just by elling the truth ; you are satirist when you consciously compel men to look at what they have tried to ignore, when you wish to destroy their illusion or pretence, when you deliberately tear off the disguise and expose the naked trith। এই নগ্ন সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করার আগে অসংগতি সম্পর্কে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ব্যঙ্গশিল্পী নানারকম কৌশলের আশ্রয় নেন। কখনো ব্যঙ্গের বিষয়কে আপাতত সমর্থন করে, কখনো Paradox-এর সাহায্যে, কখনো বা wit-irony-pun -এর সহায়তায় কৌতুকের কৌশলী হাতিয়ার তৈরি করেন এবং সেই হাতিয়ার দিয়েই শেষ পর্যন্ত প্রকৃত সত্যের আবরণ উন্মোচন করেন। এই হাতিয়ার তৈরিই ব্যঙ্গকারের শিল্পকর্ম। এই শিল্পকর্মের জন্য শিল্পীকে কিছুটা নির্লিপ্ত হতে হয়, কারণ সমস্ত ব্যঙ্গরচনার পেছনেই ব্যঙ্গকারের অন্তরের ক্ষোভ বা ক্রোধ জমা থাকে, কিন্তু ব্যঙ্গকার সেই ক্ষোভের আবেগকে সাময়িকভাবে সংযত করে নিজের হাতিয়ার তৈরির কাজে ব্যাপৃত হন। কাজেই সার্থক ব্যঙ্গশিল্পের জন্যও চাই 'emotion recollected in tranquillity । এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঃ নজরুলের ক্ষেত্রে কী ঘটেছে? নজরুলের ক্ষেত্রেও তাঁর অন্তরের ক্রোধ ও ক্ষোভই তাঁকে ব্যঙ্গপ্রবণ করে তুলেছে। কিন্তু তাঁর ক্রোধের আবেগ যেখানে সংযত মাত্রার মধ্যে অবস্থান করেছে শুধু সেখানেই তাঁর রচনায় ব্যঙ্গরচনার নানা শিল্পধর্ম পরিস্ফুট হয়েছে। নতুবা যেখানে তাঁর আবেগ মাত্রাহীন ও অনর্গল সেখানে ব্যঙ্গের কারুকর্ম দানা বাঁধতে পারে নি। ব্যঙ্গ সেখানে নিষ্করুণ বিদ্রূপ কিংবা জ্বলন্ত ধিক্কারে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন, স্বরাজ প্রসঙ্গে কবির মনোভাব দু-জায়গায় দু-রকম কাব্যরূপ লাভ করেছে।

১. সস্তা দরে দস্তা-মোড়া আসচে স্বরাজ বস্তাপচা,
কেউ বলে না 'এই যে লেহি' আস্‌লে 'ষন্ধ দেহি'র খোঁচা।
গুণীরা খায় বেগুন-পোড়া
বে-গুণ চড়ে গাড়ী ঘোড়া,
ল্যাংড়া হাসে ভেংড়ো দেখে ব্যাঙের পিঠে ঠ্যাং থুইয়ে।
দে গরুর গা ধুইয়ে ॥

২. আমরা ত জানি, স্বরাজ আনিতে, পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস!
কত শত কোটি ক্ষুধিত শিশুর ক্ষুধা নিঙাড়িয়া কাড়িয়া গ্রাস
এল কোটি টাকা, এল না স্বরাজ!
টাকা দিতে নারে ভুখারী সমাজ।
মার বুক হতে ছেলে কেড়ে খায়, মোরা বলি, বাঘ খাও হে ঘাস!
হেরিনু, জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ!

প্রথম উদ্ধৃতিতে কবি অনেকটা নির্লিপ্ত বা নৈর্ব্যক্তিক ভাবে স্বরাজ-সাধনার অসংগতিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, সেজন্য ব্যঙ্গের নানা বাচনিক কারুকর্ম স্তবকটিকে অলংকৃত করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে কবির ক্ষোভ অদম্য ও অসংযত। ক্রোধের সঙ্গে শোকের কারুণ্যে কবিকে একেবারে বিহ্বল করে তুলেছে। এজন্য ব্যঙ্গের শিল্পধর্ম এখানে ততটা পরিস্ফুট নয়। তার বদলে নগ্ন বিদ্রূপ ও নির্মম ধিক্কার প্রতিটি পংক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রকৃতপক্ষে, নজরুল স্বভাবতঃ ব্যঙ্গশিল্পী নন, অকপট সত্য-বাদী। তাঁর বহির্মুখী বিস্ফোরণ প্রবণতা এই নিরপেক্ষ সত্যকথনের আবেগকেই মুক্তি দিয়ে আনন্দ পায়, কিন্তু কোথাও কোথাও সেই মুক্তি আঘাত পেলে কবির সরলরেখ অভিব্যক্তি বক্রপথে সরে যায়। কবি তখন ব্যঙ্গপ্রবণ হয়ে পড়েন। কিন্তু নিপুণ ব্যঙ্গশিল্পীর স্থায়ী মানসিক প্রস্তুতি না থাকায় নজরুলকাব্যে ব্যঙ্গ কখনো স্থায়ী ভাবের মর্যাদা পায় নি। বস্তুত আলংকারিক পরিভাষায় বলতে গেলে নজ-রুলকাব্যে ক্রোধ হচ্ছে অন্যতম স্থায়ীভাব, আর ব্যঙ্গ তার সাময়িক 'সঞ্চারী' ॥

নজরুলের সাহিত্যচিন্তা
(১০৫২ পৃষ্ঠার পর)

নূতন সাহিত্য, এরাই আনবে নূতন ভাবধারা, এরাই গাইবে 'তাজা বতাজার গান।'" (সওগাত, পৌষ ১৩৩৪)।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা ৫ নং ম্যাঙ্গো লেনে দৈনিক 'কৃষক' পত্রিকার অফিসগৃহে জনসাহিত্য-সংসদের শুভ উদ্বোধনে নজরুল সভাপতি হিসাবে যে ভাষণ দেন তার মধ্যে জনসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মতামত পাওয়া যায়। এই ভাষণ 'নজরুল রচনা-সম্ভারে' স্থান পেয়েছে। এই ভাষণে জনসাহিত্য সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন,

"জনসাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো জনগণের মতবাদ সৃষ্টি করা এবং তাদের জন্য রসের পরিবেশন করা। আজকাল সাম্প্রদায়িক ব্যাপারটা জনগণের মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ; এর সমাধানও জনসাহিত্যের একটা দিক। সাময়িক পত্রিকাগুলোর দ্বারা আর তাদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্বারা কিছুই হবে না। সম্পাদকীয় মত উপর থেকে উপদেশের শিলাবৃষ্টির মত শোনায়। তাতে জনগণের মনের উপর কোনো ছাপ পড়ে না—জনমতও সৃষ্টি হয় না।"

এখানে নজরুল জনসাহিত্যে শুধু রস পরিবেশনের কথাই বলেন নি, তা দিয়ে জনমতবাদ গঠনের কথাও বলেছেন। এই জনমতবাদ গঠনের অর্থ তাকে জনসংগ্রামের এক দৃঢ় অবলম্বন করে তোলা। এই কাজ করা খুবই কঠিন। জনজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, ঘনিষ্ঠতাবোধযুক্ত ও সহৃদয় সাহিত্যিকই গণসাহিত্যরচনায় সার্থক হতে পারেন। এই ধরনের সাহিত্যিকেরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন তার মধ্যে জনগণ নিজেকে প্রত্যক্ষ করে উদ্বুদ্ধ হবে এবং তা স্থায়ী সাহিত্য হিসাবে গ্রহণ করবে। তাঁর ভাষায়,

"যাঁদের গ্রামের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা সেখান থেকেই তাঁদের সাহিত্য আরম্ভ করুন। স্থায়ী সাহিত্য চাই। বক্তৃতা প্রবন্ধ তাদের প্রাণে দাগ কাটতে পারে না। তাদের মত ক'রে তাদের কথা, তাদের গল্প বলুন। তারা তা বুঝতে পারবে। কিন্তু সাবধান, আপনাদের মুরুব্বিয়ানা-ভাব যেন প্রকাশ না পায় তার মধ্যে, তা হলে তারা পালিয়ে যাবে। চাষীরাও আয়না রাখে নিজেদের চেহারা যদি তার মধ্যে দেখতে পায় তবে যত্ন ক'রে রাখবে।"

জনসাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে বাইরে থেকে দরদ দেখালে চলবে না, তাদেরই একজন হয়ে উঠতে হবে। তারা যে সব বিষয়বস্তুতে অভ্যস্ত তাই নিয়ে তাদের সাহিত্য রচনা করলে তারা স্বভাবতই তার দিকে আকর্ষিত হবে। এই বিষয়বস্তু আধুনিক উচ্চমানের অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত বিষয়বস্তু না হয়ে তাদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সাধারণ পরিচিতি বিষয়বস্তু হওয়া দরকার। স্বভাবতই, আত্মাভিমানী বুদ্ধিবাদীদের এ বিষয়ে সফল হওয়া কঠিন বলে নজরুল তাদের জনসাহিত্য গড়ার কাজে আহ্বান জানন নি। বুদ্ধিবাদীদের পক্ষে সাধারণ বিষয়বস্তুকে প্রকৃত আন্তরিকতায় গ্রহণ করা শক্ত। জনসাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে ত্যাগ ও দুঃখ বরণের শক্তি থাকা প্রয়োজন। জনসাহিত্যিকেরাই জনসমস্যা সমাধানে সমর্থ। তিনি সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন,

"যাঁরা ইনটেলেকচুয়াল (intellectual), তাঁদের আমি জন-সাহিত্য গড়ার জন্য আসতে বলি না।...এ পথ কিন্তু সোজা নয়। কঠিন। ত্যাগ চাই এর পিছনে। পরে দুঃখ করলে কোন লাভ হবে না। জনসাধারণের যা সমস্যা, তা সাহিত্যিকরাই সমাধান করতে পারবেন।

জনগণের সাথে সম্বন্ধ করতে হলে তাদের আত্মীয় হতে হবে। তারা আত্মীয়ের গালি সহ্য করতে পারে, কিন্তু অনাত্মীয়ের মধুর বুলিকে গ্রাহ্য করে না।"

নজরুল মনে করেন যে জনসাহিত্যের মধ্য দিয়ে জনগণকে শিক্ষা দিতে হবে এবং তা করতে হবে মাস্টারিভাব পরিহার করে। জনসাহিত্যের সঙ্গে জনগণের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা থাকা চাই। ত্যাগের মধ্য দিয়ে জনগণকে আপনার করে নিতে পারলেই জনসাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব।

নজরুল মনে করতেন কবি কোনো আর্থিক প্রত্যাশায় কাব্য-সাহিত্য রচনা করবেন না। তিনি লক্ষ্মী প্যাঁচার আরাধনা না করে সরস্বতীর শতদলের আরাধনা করবেন। তাঁর মতে "কবি চায় না দান, কবি চায় অঞ্জলি, কবি চায় প্রীতি, কবি চায় পূজা। কবিত্ব ও দেবত্ব এইখানে এক। কবিতা আর দেবতা—সুন্দরের প্রকাশ। সুন্দরকে স্বীকার করতে হয় সুন্দর যা তাই দিয়ে।" (বেগম শামসুন্ নাহার মাহমুদকে লিখিত পত্র। নজরুল রচনা-সম্ভার ঃ পৃ ১৬১)। এখানে নজরুল কবিত্ব ও দেবত্বকে একই সুন্দরের প্রকাশ বলে অভিন্ন বলেছেন।

কবিতা লেখার জন্য নজরুল পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন স্বীকার করতেন না। তবে তিনি মনে করতেন সেই পরিমাণ বিদ্যা থাকা দরকার যাতে আনন্দকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা যায়। তিনি পণ্ডিত ও কবির মধ্যে পার্থক্য দেখাতে গিয়ে বলেছেন যে, পণ্ডিত কৃপণ এবং সে শুধু গ্রহণ ও সঞ্চয় করে, কিন্তু কবি গ্রহণ করলেও সে তার গৃহীত জিনিস দান করে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩ জানুয়ারি তারিখে শচীন করকে লিখিত একটি পত্রের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "পড়া ছাড়িস্ নে তুই, তা হলে তোকে লেখায় ছাড়বে। অবশ্য পণ্ডিত হতে আমি বলছিনে, কিন্তু আমার আনন্দকে প্রকাশের পুঁজি ত আমার থাকা চাই। পণ্ডিত জমায়, সে কৃপণ ; কবি বিলোয়, সে দাতা। কবি নেয়, কিন্তু সে দান করে,—নদীর দু'পাশে ফুল ফুটিয়ে।...জরদগবের মত তোর পেটটা গজ্‌গজ্ করুক বিদ্যেয়, এ আমি বলছি নে, তাই বলে জানতে শুনতে যতটুকু জানাশোনার দরকার—তা থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখবি কেন?" (নজরুল রচনা-সম্ভার ঃ পৃ ১৭১)। তিনি কবির পক্ষে অন্য বড় বড় কবির কাব্য পড়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। কেননা এতে কবির আত্মপ্রকাশের বেদনা লঘু হয়। তাঁর উক্তি, "বড় বড় কবির কাব্যপড়া এই জন্য দরকার যে তাতে কল্পনার জট খুলে যায়, চিন্তার বন্ধ ধারা মুক্তি পায়। মনের মাঝে প্রকাশ করতে না পাবার যে উদ্বেগ, তা সহজ হয়ে ওঠে। মাটির মাঝে যে পত্র-পুষ্পের সম্ভাবনা, তা বর্ষণের অপেক্ষা রাখে। নইলে তার সৃষ্টির বেদনা মনের মাঝেই গুমরে মরে।" (শামসুন্ নাহার মাহমুদকে লিখিত পত্র। নজরুল রচনা-সম্ভার ঃ পৃ ১৬৩)।

পূর্বেই বলেছি নজরুল বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃত সাহিত্য হবে সব দেশ কাল ও মানবজাতির। কোনো বিশেষ ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে সাহিত্যকে বাঁধতে গেলে তার প্রকৃত আদর্শ ও উদ্দেশ্য খর্ব হয়। সাহিত্যের বাইরে একটা ধর্ম বা মতবাদ থাকতে পারে, কিন্তু তাকে

নিয়ে প্রকৃত সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়া দরকার। 'মুসলিম সাহিত্য' কথাটার মানে প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, " 'মুসলিম-সাহিত্য' কথাটার মানে নিয়ে অনেক মুসলমান সাহিত্যিকই কথা তুলবেন হয়ত। ওর মানে কি মুসলমানের সৃষ্ট সাহিত্য, না মুসলিম-ভাবাপন্ন সাহিত্য? যদি সত্যিকার সাহিত্য হয়, তবে তা সকল জাতিরই হবে। তবে তার বাইরের একটা ধর্ম থাকবে নিশ্চয়। ইস্‌লাম ধর্মের সত্য নিয়ে কাব্য-রচনা চলতে পারে, কিন্তু তার শাস্ত্র নিয়ে চলবে না। ইস্‌লাম কেন, কোন ধর্মেরই শাস্ত্র নিয়ে কাব্য লেখা চলে বলে বিশ্বাস করি না।" (ইব্রাহিম খাঁনকে লেখা পত্র। নজরুল রচনা-সম্ভার : পৃ ১৮৪)।

নজরুলের মতে বাঙলা সাহিত্য সংস্কৃতের দুহিতা না হলেও তাকে পালিতা কন্যা বলা চলে। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই সাহিত্যে হিন্দুর ভাবধারা বিশেষভাবে যুক্ত হয়েছে এবং তাকে বাদ দিলে বাঙলা ভাষার অর্ধেক ফোর্স বা শক্তি হ্রাস পাবে। এই প্রসঙ্গে ইংরেজি সাহিত্য থেকে গ্রীক পুরাণের ভাব বাদ দেওয়াকে অভাবনীয় বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। তাঁর ধারণায় বাঙলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই সাহিত্য। তাই এই সাহিত্যে হিন্দুর দেবদেবীর নামের সঙ্গে মুসলমানী শব্দের সহাবস্থান অনায়াসে ও যুক্তিযুক্তভাবেই থাকতে পারে। নজরুল হিন্দু-মুসলমানের মিলনে সম্পূর্ণ আস্থা রাখেন বলেই উভয়ের সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই হিন্দু-দেবদেবীর নাম ও মুসলমানী শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এইভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হওয়ার জন্য তাঁর কাব্যের সৌন্দর্য বজায় না থাকার বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। তিনি স্বীকার করেছেন, "আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাদের এ-সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্য অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্যহানি হয়েছে। তবু আমি জেনে শুনেই তা করেছি।" (ইব্রাহিম খাঁনকে লেখা পত্র। নজরুল রচনা-সম্ভার : পৃ ১৮৬)।

নজরুল সাহিত্যে ভাব বা ভাষার বিষয়ে যে কোন রকম অস্পৃশ্য-তার বিরোধী ছিলেন। তিনি বাঙলা ভাষায় যে ফোর্স বা শক্তির সঞ্চার করেছেন তার মূলে আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার অনেক পরিমাণে ক্রিয়াশীল ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বিশ্বকাব্য-লক্ষ্মীর একটি মুসলমানী ঢং থাকায় আরবী ও ফারসী শব্দের অবাধ ব্যবহার বাঙলা সাহিত্যে একাধারে শক্তি ও সৌন্দর্য সঞ্চারিত হয়েছে। তিনি তাঁর 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' (আত্মশক্তি, ৩০ ডিসেম্বর ১৯২৭) প্রবন্ধে লিখেছেন, "আমি মনে করি, বিশ্বকাব্যলক্ষ্মীরও একটা মুসলমানী ঢং আছে। ও সাজে তাঁর শ্রীর হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্তীও• ও-ঢং-এর ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন।"

নজরুল পল্লীর ও শহরের কবির কবিমানসের পার্থক্য লক্ষ করেছেন। পল্লীর স্বভাবকবি নিজের মনের ভাব সহজ ও অনাড়ম্বর ভাবে প্রকাশ করে। অপরপক্ষে শহরের সভ্য আধুনিক কবির কাব্যে প্রকাশভঙ্গির জটিলতা লক্ষ্য করা যায়, কেননা সভ্যতার অধিকতর আশীর্বাদপুষ্ট শহরের কবিরা পল্লীর সহজতাকে হারিয়ে ফেলে। গিরীন চক্রবর্তীর 'সুজনের গান' নামক গীতিগ্রন্থের সমালোচন প্রসঙ্গে নজরুল লিখেছিলেন, "সভ্যতার আওতায় মানুষ হয়ে আমরা আমাদের অনুভূতিকে প্রকাশ করি—যত রকমে পারি জটিল কুটিল করে। প্রকাশের জটিলতাই আধুনিক সভ্য কবিদের ভঙ্গি বা 'ডিক্‌-শন'। পল্লীকবিদের প্রকাশভঙ্গি পল্লীবাসিনীর মতোই সহজ সরল —কোথাও হয়তো অর্ধনগ্ন। কিন্তু সে নগ্নতায় বাসনার আমন্ত্রণ নাই—আছে আত্মভোলা মগ্ন মনের মাধুরী। আজকালকার কবিতার মিলের 'মিল এরিয়া' পেরিয়ে যে উদার আকাশ, উন্মুক্ত প্রান্তর, নগ্ন খাল-বিলের সহজ শ্রী, তাকে দেখতে হলে আমাদের পড়তে হয় নিরক্ষর পল্লীকবিদের গান ও কবিতা। এঁরা যেন প্রকৃতির অন্তরঙ্গ—এবং এঁরাই প্রকৃতির অন্তরে স্থান পেয়েছেন।" (সওগাত, মাঘ ১৩৪৭)। নজরুল এখানে পল্লীকবির কাব্যকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তা তাঁর গ্রাম দেশের বিষয়ে প্রকৃত মমত্ববোধ থেকে উৎসারিত।

বাঙলা সাহিত্যে সার্থক ব্যঙ্গরচনার অভাব নজরুলকে বিশেষ-ভাবে পীড়িত করেছিল। শুধু ইংরেজি সাহিত্যেরই নয়, সম্পদশালী সব সাহিত্যেই ব্যঙ্গসৃষ্টির বিষয়টি তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। তিনি ব্যঙ্গসাহিত্যস্রষ্টাদের উচ্চ মর্যাদার আসন দিতে কুণ্ঠিত হন নি। কেননা তাঁর ধারণায় ব্যঙ্গসাহিত্য সৃষ্টি করতে অসামান্য প্রতিভার দরকার। আবুল মনসুর আহমদের 'আয়নার ফ্রেম' গল্পগ্রন্থের গুণো-লোচনায় তিনি লিখেছেন, "বাংলা ভাষায় ব্যঙ্গ-সাহিত্য খুব উন্নত হয় নি, তার কারণ, ব্যঙ্গ-সৃষ্টিতে অসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন। এ যেন সেতারের কান মলে সুর বের করা—সুরও বেরুবে, তারও ছিঁড়বে না।" (নজরুল-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড। ঢাকা ১৯৭০ : পৃ ৬৮১)। উক্ত আলোচনায় ব্যঙ্গসাহিত্যের একটা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে তিনি বলেছেন, "...সে ব্যঙ্গ যখন হাসায় তখন হয় সে ব্যাঙ। কিন্তু কামড়ায় যখন, তখন হয় সাপ ; আর সে কামড় গিয়ে যার গায়ে বাজে তার মুখের ভাব হয় সাপের মুখের ব্যাঙের মতই করুণ।" (ঐ : পৃ ৬৮১)। তাঁর মতে সে হাসির পিছনে যে অশ্রু ও কামড়ের পিছনে যে দরদ তা ধরতে পারলেই ব্যঙ্গের প্রকৃত রসোপলব্ধি ঘটা সম্ভব।

নজরুলের সাহিত্যচিন্তার যে পরিচয় দেবার চেষ্টা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় তিনি সাহিত্যসৃষ্টির বিষয়ে বিশেষভাবে ভাবিত ছিলেন। বাঙলা সাহিত্যকে তিনি সব দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করে গেছেন। অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ ও বিভিন্ন ছন্দ, শব্দ ইত্যাদি প্রয়োগ করে তিনি যথেষ্ট সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি করতে চেয়েছেন এবং তা করার জন্য প্রাচীন ও নবীন সবকিছুকেই গ্রহণ করতে উৎসাহী হয়েছেন। নিছক প্রচারের মাধ্যম হিসাবে সাহিত্যকে ব্যবহার করলে যে সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় এ বিষয়ে তিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। তাঁর সাহিত্যচিন্তায় ইতিহাস ও কালজ্ঞানের বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটেছে।

নজরুলের সাহিত্যচিন্তায় সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের বিশেষ প্রভাব থাকলেও, পাশ্চাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিকদের ধারণার প্রতিফলনও দেখা যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে তেমন পরিচয় না থাকলেও সৌন্দর্য ও সত্যের ধারণায় তিনি সৎসাহিত্যিকসুলভ অনুভবের মধ্য দিয়ে সেই তত্ত্বকে অনেকাংশে ধরতে পেরেছেন। সত্য ও সৌন্দর্যের তাৎপর্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সমধর্মিতা বিশেষ-ভাবে চোখে পড়ে। অবশ্য এর একটা বড় কারণ এই যে উভয় কবি একই ভারতবর্ষের সাহিত্যিক ঐতিহ্যে লালিত। কিন্তু জনসাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে নজরুল রবীন্দ্রনাথের তুলনায় আরও মুক্ত ও ব্যাপক মনোভাব গ্রহণ করেছেন এবং এখানে তাঁর চিন্তার বিশেষ লক্ষণ ফুটে উঠেছে। সময় ও ইতিহাস সচেতন কবি তাঁর বিশেষ সাহিত্যবোধ ও চিন্তা থেকে নতুন যুগের কবির উদ্দেশ্যে 'সন্ধ্যা'গ্রন্থভুক্ত 'জাগরণ' কবিতায় বলে উঠেছেন,

"তারাই দানব অত্যাচারী—যারা মানুষ মারে,
সভ্যবেশী ভণ্ড পশু মারতে ডরাস্ কারে?
এতদিন যে হাজার পাপের বীজ হয়েছে বোনা
আজ তা কাটার এল সময়, এই সে বাণী শোনা।
নতুন যুগের নতুন নকীব, বাজা নতুন বাঁশী,
স্বর্গ-রাণী হবে এবার মাটির মায়ের দাসী!"

রবীন্দ্রসমসাময়িক কালেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম, রাশিয়ার মহান নভেম্বর বিপ্লবের ব্যাপক প্রভাব এবং দেশের মধ্যেকার বহুকালের পুঞ্জীভূত অন্ধকার কুসংস্কার ইত্যাদি ঘটনা দেশের যুব চেতনায় আলোড়ন সৃষ্টি করছিল বেশ কিছুদিন থেকেই। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ ক্রমশই সোচ্চার হচ্ছিল, বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলাম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের জাগ্রত জনমনে বাঁধনহারা জোয়ারের প্লাবন এনে দিলেন। আক্ষরিক অর্থেই আসা, দেখা ও জয়করা। রবীন্দ্রযুগে অন্যান্য কবিরা যখন একান্তভাবেই নিষ্প্রভ একমাত্র নজরুলই নিজ ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যে বিশেষভাবে উজ্জ্বল। যুগলক্ষণাক্রান্ত চারণকবি নজরুল দুর্দমনীয় প্রাণশক্তি ও সীমাহীন আবেগ নিয়ে বাংলা কাব্যে, সমাজপ্রতিবেশে এবং তৎকালীন রাজনৈতিক বিবাদের জগতে এক নতুন আগমনী শঙ্খের ঘোষণা উপস্থিত করলেন। নজরুল আত্মসমাহিতির কবি নন, একান্তভাবেই সমাজ জাগরণের কবি।

দেশের মুক্তি আন্দোলনে এবং দেশের বিদেশী শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কবি ছিলেন একজন সৈনিক-পথিকৃৎ। সমগ্র পৃথিবী তখন ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিস্ময় ফল ভোগ করেছে। আলোর বুকে ঠুলি পরিয়ে ট্রেঞ্চে সময় গুনছে দুনিয়ার মানুষ। তখন বাঙলীদের নিয়ে একটা সৈন্যদল গঠন করার জন্য আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার বাঙালীর হাতে অস্ত্র তুলে দেবার ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করছিল। অবশেষে বাঙালীদের নিয়েই সৈন্যদল গঠন করতে হল। দলে দলে যুবকদের সৈন্যদলে যোগদানের জন্য ডাক এল দেশ নেতাদের কাছ থেকে। কেরানী হবার বদলে সৈন্যদলে যোগদান করলে স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পরবে এই ছিল আশা। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিম্নবিত্ত কৃষকপরিবারের সন্তান শিয়ারসোল রাজস্কুলের কৃতী ছাত্র নজরুল বেরিয়ে এসে বেঙ্গল রেজিমেণ্টে যোগ দিলেন। পৃথিবীর মানচিত্রের এক প্রান্ত থেকে আরএক প্রান্ত

সাংবাদিকতায় নজরুল ।। প্রণব চট্টোপাধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাত এবং তার অব্যবহিত পরেই রুশ বিপ্লবসৃষ্ট নতুন চিন্তা ও মূল্যবোধ সমগ্র বিশ্বের মতো ভারতবর্ষকেও ভাবিয়ে তুলল। ইংলণ্ড আমেরিকার উপনিবেশগুলির অধীনতা মুক্ত হবার আন্দোলনে এক নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনার অভিঘাত দেখা গেল। এতাবৎকালের মুক্তি আন্দোলনে বুর্জোয়া নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অংশগ্রহণের পাশাপাশি শ্রমিক কৃষক ও নিম্নবিত্ত শিক্ষাবঞ্চিত মানুষের অংশগ্রহণের আগ্রহ ও ব্যাপকতা বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠল। "একজন যথার্থ মহৎ লেখকের বা শিল্পীর সৃষ্টিতে বিপ্লবী ভাবনার কিছুমাত্র উপাদানের প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী থাকে।" লেনিনের এই উক্তির যথার্থতা নজরুল সাহিত্যে একান্ত-ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রমিক কৃষকের ব্যাপক অংশগ্রহণ যে অনিবার্য এই সত্য-উপলব্ধি তাঁর চিন্তায় ধরা পড়েছিল।

বাংলা সাহিত্যে এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে নজরুলের পরিচয় শুধুমাত্র কবি হিসেবেই নয়। বৈজ্ঞানিক ও বিপ্লবী চেতনায় সমৃদ্ধ, নতুন মূল্যবোধে উজ্জ্বল বলিষ্ঠ শিড়দাঁড়াসোজা কবিতা রচনার মাধ্যমে মানুষকে জাগ্রত করার সাধনার সঙ্গে সঙ্গে পর্যন্ত ছুটতে থাকলেন হাবিলদার নজরুল ইসলাম। মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যে দাঁড়িয়ে জয় করলেন মৃত্যুভয়। করাচীর সৈন্যব্যারাকে বসে অস্ত্র চালনার সঙ্গে সঙ্গে গোপনে পড়তে থাকলেন দেশবিদেশের পত্র-পত্রিকা, বই-পুঁথি। সমগ্র পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের স্বাধীন সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করছিলেন মহান লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী। রাশিয়ার বলশেভিকদের স্বপ্ন তখন নজরুলের বিশাল দুটি চোখে বাসা বেঁধেছে।

॥ দুই ॥

দেশে ফিরলেন নজরুল। কাব্যরচনা ও সেইসঙ্গে পত্রিকা সম্পাদনা করে দেশের মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করার প্রয়োজন বোধ করলেন স্বাভাবিক ভাবেই। সৈন্য ব্যারাক থেকেই নজরুল "সওগাত," "বঙ্গীয় মুসলমান পত্রিকা" ইত্যাদিতে নিয়মিত লেখা পাঠাচ্ছিলেন। অনেক দীর্ঘ চিঠি পত্র তখন তিনি পাঠিয়ে সাহিত্য ভাবনার গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির কথা সোচ্চারে প্রকাশ করতেন। ১৯২০ সালে প্রকাশিত "মোসলেম ভারত" পত্রিকাতে বিশেষকরে এধরনের চিঠি বেশী প্রকাশ পায়। ১৯২০ সালে মার্চে ফৌজ থেকে

ফিরে আগামী দিনের শ্রমিকশ্রেণীর নেতা শ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেবের সাথে পরিচিত হয়ে একসঙ্গে বসবাস করতে থাকেন। সেই থেকেই একে অপরের সারাজীবনের অকৃত্রিম বন্ধু ও সহযোদ্ধা রূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। দেশের অবস্থা তখন নানাদিক থেকেই বেশ গরম। পাঞ্জাবের নিষ্ঠুর অত্যাচারের দুঃস্বপ্ন তখনও মানুষের চোখ থেকে মুছে যায়নি। ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার আইন দেশের মানুষ কিছুতেই মেনে নিতে চাইছে না। জাতীয় নেতাদের মধ্যে দ্বিধা-বিহ্বলতা, বহুদূরত্বের বাধা কাটিয়েও রুশ বিপ্লবের ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছিল, ধর্মঘটের পরে ধর্মঘটে শ্রমিকশ্রেণী চঞ্চল। বিশ্বযুদ্ধের মুনাফায় কিছু লোকের হাতে অস্বাভাবিক অর্থাগম এবং তৎসৃষ্ট নতুন নতুন কারখানা, অপরদিকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মহামারী ইত্যাকার সব ঘটনায় বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ একান্তই উদ্বেলিত। এই নতুন পরিস্থিতি এবং নতুন মূল্যবোধ, নতুন চিন্তা-চেতনাকে ভাষারূপ দেবার কথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করলেন নজরুল। নতুন ভাবদর্শে সমৃদ্ধ পত্রিকার অভাবও ছিল তখন। সাধারণভাবে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে জাগ্রত করার কাজে "হিন্দু পেট্রিয়ট্", "সোমপ্রকাশ" "নিউ ইণ্ডিয়া", "সন্ধ্যা" বা "সাপ্তাহিক যুগান্তর" প্রভৃতি পত্র পত্রিকার যথেষ্ট উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। কিন্তু শ্রমিক-কৃষক নিম্নবিত্তের মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার নব চেতনা উল্লিখিত সমস্ত পত্রিকায় তেমন ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। অনেকেরই পরামর্শমতো নজরুল ও মুজফ্ফর আহমদ নতুন পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে মনস্থির করে ফেললেন। আর্থিক এবং অন্যান্য সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ১৯২০ সালের মাঝামাঝি সময়ে এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের মালিকানায় এবং নজরুল ও মুজফ্ফর আহমদের সম্পাদনায় "নবযুগ" সন্ধ্যা দৈনিক আত্মপ্রকাশ করল। হক সাহেব তাঁর এই নতুন পত্রিকার একটি মুসলমানী নাম দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। মুসলমান পাঠকদের সম্পূর্ণভাবে আকর্ষণ করা ছিল উদ্দেশ্য। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হিসাবে ফজলুল হক সাহেবের নাম ছাপা হত। নামকরণের ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বর্জন করায় নবলব্ধ রাজনৈতিক চেতনারই জয় হল। মুসলমানের ছেলেরা তেমন ভালো বাংলা লিখতে পারবেনা এই আশঙ্কায় হক সাহেবের ইচ্ছে ছিল তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত পেশাদায় সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'নবযুগের' জন্য সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখানো। কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পত্রিকা সম্পাদকের কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ দুইজনের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের ফলেই অল্পদিনের মধ্যেই নবযুগের প্রতিষ্ঠা ও চাহিদা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। হক সাহেবের পুরাতন মেশিনে ছেপে সেই চাহিদার জোগান দেওয়া কণ্টকর হয়ে উঠল। পত্রিকার সংবাদের স্থান সঙ্কুলানের জন্য বড়সংবাদগুলিকে অত্যন্ত দ্রুততা এবং মুন্সিয়ানার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত করে প্রকাশ করা হতে থাকে। নজরুলের লেখা সম্পাদকীয় অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠল। বৈষ্ণব পদসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের গান থেকে অনেক আকর্ষণীয় লাইন তুলে তিনি সংবাদের হেডিং করতেন। তাতে শ্লেষের কষাঘাত অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠত। যেমন : "আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার। পরাণ সখা কৈসুল হে আমার" "কালাতে ধলাতে লেগেছে এবার মন্দমধুর হওয়া, দেখি নাই কভু দেখি নাই ওগো এমন ডিনার খাওয়া।" (উর্দু-আরবি ও বাংলা কাব্যের আটপৌরে সব শব্দ ব্যবহার করে ঝরঝরে বাংলায় গদ্য ও পদ্য লিখতে থাকলেন নজরুল। সাম্রাজ্যবাদী বিরোধিতা বা দেশাত্মবোধক বক্তব্য ছাড়াও শ্রমিক-কৃষক-নিম্নবিত্ত মানুষের অবস্থা এবং প্রতিবাদী মনের প্রতিফলন দেখা গেল 'নবযুগের' পাতায়।

১৯২০ সালের শ্রমিক ধর্মঘটগুলির সমর্থনে জ্বালাময়ী সব সম্পাদকীয় লেখা হতে থাকল। সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা তুলে ধরাই ছিল নবযুগের কাজ। বিশেষ করে ইংলন্ডের শ্রমিক শ্রেণীর কাগজ "ডেইলী হেরাণ্ডের মারফতে ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল্ হওয়াই ছিল নবযুগের একান্ত উদ্দেশ্য। দেশের ভিতরকার জাতীয় ভাবপ্রবণ আন্দোলনের চেহারা তুলে ধরার পাশাপাশি মজুর কৃষকদের দুর্দশার কথাও বলিষ্ঠ ভাবে প্রকাশ পেতে থাকল। অচিরেই ইংরেজ সরকারের আক্রমণ এল পত্রিকার উপর। কিছু সরকারী বিধিতে পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে সাবধান করে দেওয়া হল। নবযুগে নজরুলের 'ধর্মঘট' নামক প্রবন্ধটি তখন বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই প্রবন্ধের কিছু উদ্ধৃতি থেকেই উপলব্ধি করা যাবে কবির শ্রেণীসচেতনার পরিষ্কার চেহারা :

"ধর্মঘটের আগুন এখন দাউ দাউ করিয়া সারা ভারতময় জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং ইহা সহজে নিভিবার নয়। কেননা ভারতেও এই পতিত উপেক্ষিত নিপীড়িত হতভাগ্যদের জন্য কাঁদিবার লোক জন্মিয়াছে। এদেশেও মহত্তর মানবতার অনুভব সকলেই করিতেছেন। সুতরাং শ্রমজীবী দলের ও সেইসঙ্গে তথাকথিত গণতন্ত্র ও ডিমোক্রিসির জাগরণও এদেশে দাবানলের মতো ছড়াইয়া পড়িতেছে ও পড়িবে। কেহই উহাকে রুধিতে পারিবেনা। পশ্চিম হইতে পূর্বে ক্রমেই ইহা বিস্তৃতিলাভ করিতেছে এবং ধর্মঘটক্লিষ্ট মুমূর্ষু দাঁতের শেষ কামড়, ইহা বিদ্রোহ নয়।"

'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?' নামের নিবন্ধ প্রকাশের পরই নবযুগের জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হল। এই নিবন্ধে শহীদদের আত্মত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে জাতি-ধর্ম সংকীর্ণতার উর্ধ্বে দাঁড়িয়ে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের উদাত্ত আহ্বান জানালেন :

"স্বাধীনতাকে, মনুষ্যত্বকে এমন নির্মমভাবে দুই পায়ে মাড়াইয়া চলিবে আরকতকাল? এই অত্যাচারের, এই মিথ্যার বনিয়াদে খাড়া তোমাদের ঘর—মনে কর কি চিরদিন খাড়া থাকিবে?…এই মহাশক্তির ভীষণতা আজো কি তোমার চক্ষে পড়ে নাই? তোমাদের অত্যাচারে, জুলুমে নিপীড়িত হইয়া, মানবাত্মার—মনুষ্যত্বের এত পাশবিক অবমাননা সহ্য করিতে

না পারিয়া মানুষের মত যাহারা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে পারিল যে এখানে আর ধর্মকর্ম চলিবে না এবং চিরদিনের মত তোমাদের সংস্রব ছাড়িয়া তোমাকে সালাম করিয়া বিদায় লইল। সেই বিদায় দিনেও তাহাদের উপর পশুর মত ব্যবহার করিতে তোমাদের লজ্জা হইল না, দ্বিধা হইল না।”

'গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ', 'আমাদের শক্তি স্থায়ী হয়না কেন, 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি,' 'ছুতমার্গ' ইত্যাদি নবযুগের উল্লেখযোগ্য রচনা। নবযুগের প্রবন্ধসমূহ পরবর্তী সময়ে "যুগবাণী" নামে পুস্তকে প্রকাশিত হয়। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নজরুল নবযুগ ছেড়ে চলে আসেন। ১৯২১ এ মুজফ্ফর আহ্মদও চলে আসায় নবযুগ বন্ধ হয়ে গেল। পত্রিকার মালিক ফজলুল হক সাহেব পত্রিকার চেহারা দেখে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই সন্তুষ্ট থাকতে পারছিলেন না। তারই পরিপূর্ণ ফলশ্রুতি হিসেবে পত্রিকা অবশেষে বন্ধ হল।

১৯২২ সালে নজরুল "সেবক" নামের এক প্রভাতী দৈনিকে কিছুদিন সাংবাদিকতার কাজ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের মুখপত্র ছিল "সেবক"। কবিসুহৃদ ছান্দসিক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অকাল মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাহত হয়ে সত্যেন্দ্রনাথের জননী ও স্ত্রীর মর্মান্তিক অবস্থা উপলব্ধি করে যে কবিতা লিখেন তা সেবকেই প্রকাশ পায়। দেশের অগ্নিগর্ভ অবস্থাকে জনগণের সামনে তুলে আনার অঙ্গীকার নিয়ে যে কেউ তখন পত্রিকা পরিচালনা করেছেন সেই সব পত্রিকাই কবির সাহায্য সহযোগিতা লাভ করেছেন অকৃপণভাবে। তখন নজরুল 'আত্মশক্তি', 'উপাসনা', 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'সংহতি', 'নারায়ণ' 'বাংলার কথা' 'মোহাম্মদী,' 'মোসলেম ভারত', 'মানসী', 'ভারতী' 'নূর' ইত্যাদি অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় একধারে কবিতা, এবং দেশীয় নানা সমস্যা নিয়ে ধারালো সব গদ্য রচনা করেন। ইতিমধ্যে কবির বিখ্যাত "বিদ্রোহী" কবিতা 'বিজলী' সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পরই বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের জনপ্রিয়তা গগনস্পর্শী হয়ে উঠল। বাংলার যুব শ্রেণীর কাছে নজরুল হয়ে উঠলেন যথার্থ প্রতিবাদী আদর্শ। এই সময়ই মুজফ্ফর আহমদ এবং আরও কয়েকজন বন্ধুর আর্থিক ও অন্যান্য সমস্ত প্রকার সাহায্য সহযোগিতায় বাংলা সাহিত্যে "ধূমকেতুর" আত্মপ্রকাশ ঘটল। "ধূমকেতু" কবির জীবনে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯২২ সালের ১২ আগস্ট তারিখে অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশীর্বাণীতে বললেন:

"আয় চলে আয়রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!
অলক্ষণের তিলক লেখা
রাতের ভালে হোকনা লেখা
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধ চেতন।"

কবি নজরুলের প্রতিভা সম্পর্কে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সুগভীর আস্থা ও ভালবাসা মূর্ত হয়ে উঠল। ধূমকেতুর আবির্ভাবকে স্বাগত জানালেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিপ্লবী বারীন ঘোষ, কবি কালিদাস রায়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফজলুল হক সেলবর্সী, অমৃত বাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা, মোহম্মদী, হিতবাদী, আত্মশক্তি প্রভৃতি তদানীন্তনকালের প্রথম শ্রেণীর পত্র পত্রিকা এবং সাহিত্য-রাজনীতি জগতের কাজী মানুষেরা। ধূমকেতুর মাধ্যমে নজরুল প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত তরুণদের কাছে তার বক্তব্য নিয়ে হাজির হলেন। নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনের উপর দেশের যুব-মানস ক্রমশই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছিল। তাঁদের কাছে ধূমকেতুর বার্তা যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করল। বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী দল বিশেষ করে 'যুগান্তর', গোষ্ঠী ধূমকেতুর অত্যন্ত কাছে এসে দাঁড়াল। প্রখ্যাত উর্দু কবি ফজলুল হাসন্ হসরৎ মোহানী আমেদাবাদে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশনে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলার অপরাধে মামলায় জড়িয়ে গেলেন। এ খবর জানা সত্ত্বেও কবি নজরুল ইসলাম ১৯২২ এর ১৩ অক্টোবর সংখ্যায় লিখলেন: সর্বপ্রথম ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজটরাজ বুঝি না, কেন না ওকথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষে এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না···ইত্যাদি ইত্যাদি। নজরুলের আগে এমন স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাষায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অন্য কোন দেশ নেতাও দাবি করতে পারেন নি। 'ধূমকেতুতেই' ভারতের পূর্ণ দাবি সর্বপ্রথম সোচ্চারে ঘোষিত হয়। হজরত মোহানীর দাবি পাশ হতে পারেনি। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রভাবশালী গোষ্ঠী কোনো গণ-ভিত্তিক সংগ্রামের বদলে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদীর হাত থেকে ক্ষমতা অধিগ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। তৎকালীন দেশনেতাদের 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' শ্লোগানকে শাণিত ভাষায় ব্যঙ্গ করে নজরুল বলেছেন:

'রাজা শুধু রাজাই রবেন। পগার পারে নির্বাসন
রাজ্য নেবে দুভাই মিলে। দুর্যোধন আর দুঃশাসন'। অথবা
বন্দিনী মা ছিলেন আহা। আজ দিয়েছ মুক্তিরে
বাজাও ধামা মামার নামে। রক্ত ঢাল বুক চিরে।'

সেসময় জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের চরমপন্থী ও নরমপন্থী মনোভাবের ভিতরকার টানাপোড়েনে রাজনৈতিক আন্দোলন

আবর্তিত হচ্ছিল, নজরুল ধূমকেতুর প্রবন্ধে সেই আন্দোলনের গতিকে একটা বিশেষ দিকে ফেরাতে চেয়ে তীব্রভাষায় লিখলেন :

'দেশকে যে নারীর করুণা দিয়ে সেবা করে সে পুরুষ নয় হয়ত মহাপুরুষ। কিন্তু দেশ এখন চায় মহাপুরুষ নয়, দেশ চায় সেই পুরুষ যার ভালোবাসায় আঘাত আছে, বিদ্রোহ আছে। যে দেশকে ভালোবেসে শুধু চোখের জলই ফেলবে না, সে দরকার হলে আঘাতও করবে, প্রতিঘাতও বুক পেতে নেবে, বিদ্রোহ করবে।' বা অন্য এক নিবন্ধে বাংলার তরুণদের উদ্দেশ্যে বলছেন : 'বাংলার ছেলে তুমি বল আমি সব দেব, আমি সব নেব, পারিবে কি? যখন অগ্রসর হইতে হইতে একটি একটি করিয়া সেনাপতি আহত হইয়া পড়িবে, তখন সেই শ্মশানে নিজ স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারিবে কি? শত্রুর সেনা যখন তোমার ঘরে রক্তস্রোত বহাইয়া দিবে তখন তোমার চক্ষু পশ্চাতে ফিরিবে না তো?…এ অন্ধকারে তোমরা চলিতে পারিবে তো? মাতার ক্রন্দন, প্রিয়ার ব্যকুলতা দলিত করিয়া একা এই অন্ধকার পথ চলিতে পারিবে তো?' ধূমকেতুর অন্যতম অগ্নিস্রাবী সম্পাদকীয় রাজবন্দীর জবানবন্দী নিবন্ধে বলেছেন :

'আজ ভারত পরাধীন। তার অধিবাসীবৃন্দ দাস। এটা নির্জলা সত্য। কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ। এ তো ন্যায়ের শাসন হতে পারে না। এই যে জোর করে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বলানো একি সহ্য করতে পারে। এ শাসন কি চিরস্থায়ী হতে পারে? এই বলিষ্ঠ অনুভূতি, উদাত্ত আহ্বান এবং অঙ্গীকার এসবই রুশ বিপ্লবের মহান শিক্ষা। ধূমকেতুর এইসব রচনা স্বাভাবিক কারণেই ইংরাজসরকার এবং কায়েমী স্বার্থের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। এই কাগজের পেছনে কোন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী রাজনৈতিক দল আছে এই চিন্তা করে পুলিশী তৎপরতা ভীষণভাবে বেড়ে গেল। এ প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ নজরুল স্মৃতি কথায় লিখেছেন : 'গবর্ণমেন্টের বাংলা অনুবাদকের অফিসে নজরুলের লেখা ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে ডিপার্টমেন্টের পলিটিক্যাল সেক্‌শনে অফিসারদের টেবিলে চলে যেত। তাঁরা লেখাগুলির ওপর মন্তব্য করতেন। শুনেছি এমন দেশীয় অফিসাররাও সেখানে ছিলেন যাঁরা নজরুলের কবিতাগুলিকে বাজেয়াপ্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে চাইতেন।' কিন্তু আর খুব বেশিদিন ধূমকেতু পুলিসী প্রত্যক্ষ আক্রমণের বাইরে থাকতে পারল না।

১৯২২-এর ২৬ সেপ্টেম্বর 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামের কবিতা ধূমকেতুতে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার পত্রিকার সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত করে কাগজকে বে-আইনী ঘোষণা করেন। শারোদৎসবের প্রাক্‌কালে রচিত এই কবিতায় কবির অমোঘ জিজ্ঞাসা :

'আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী—শক্তি চাঁড়াল।
দেব শিশুদের মারছে চাবুক, বীর-যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি
ভূভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী?'

এই কবিতা বঙ্গবাসীর প্রচলিত ভক্তি-ভাবনা এবং মূল্যবোধকে ভেঙে খান খান করে দিল। তৎকালীন জোর স্বদেশী কাগজ বলে প্রচারিত প্রফুল্ল সরকার, সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখের আনন্দবাজার পত্রিকাও উল্লিখিত কবিতাটি তাদের শারদসংখ্যায় আমন্ত্রিত লেখা হিসেবে পেয়েও প্রকাশ করতে সাহসী হননি। এই কবিতা প্রকাশিত হবার পরই কবির নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী করে ১৯২২ এর নভেম্বর কুমিল্লায় নজরুলকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারায় এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কারাগারের ভিতরকার অব্যবস্থা এবং অত্যাচারের প্রতিবাদে ৩৯ দিন তিনি অনশন করেন। নজরুল গ্রেপ্তার বরণের অব্যবহিত পরে অমরেশ কাঞ্জিলালের সম্পাদনায় ধূমকেতু কিছুদিন প্রকাশিত হয়ে পরে বন্ধ হয়ে যায়। ধূমকেতুর অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে 'আজ চাই কি, 'তোমার পণ কি', 'আমি সৈনিক', 'কামাল' 'বিষবাণী' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

। চার।

কারাবাসের কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়ে নজরুলের মনোভাব অনেকখানি আবেগবর্জিত হয়ে বৈজ্ঞানিক অভিধায় পরিশুদ্ধ হয়ে উঠল। শ্রেণী চেতনা কবির মধ্যে উদ্বেল হয়ে উঠল। বিশ্ববিপ্লবের অগ্রগামী শক্তি হিসেবে শ্রমিক কৃষক ও নিম্ন-বিত্তের মানবধারার উপর আস্থাবোধ সৃষ্টি হল। ১৯২৫ এ প্রতিষ্ঠিত হল ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজেন্টস পার্টি অব বেঙ্গল' ভারতের চাষী মজুরের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হতে থাকল। প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন, কৃষ্ণনগরে ছাত্র সম্মেলন, শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে তখন নজরুল মগ্ন হয়ে আছেন। ১৯২৫ সালেই 'লেবার স্বরাজ পার্টির মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হল লাঙল'। প্রথমদিকে নজরুলই প্রধান পরিচালক ছিলেন। অল্পকিছুদিন পরে নজরুলের সাথে পুনরায় যুক্ত হলেন ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ অ্যবাল্য সাথী মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেব। লাঙলের প্রথম সংখ্যায় কবির 'সাম্যবাদী' কবিতাটি প্রকাশিত হলে নবলব্ধ চেতনায় বাঙালী মানস উদ্বোধিত হল। লাঙলের পাতায় নজরুলের 'ভারত কেন স্বাধীন নয়, 'কোথায় প্রতিকার' 'শ্রেণীসংগ্রাম' 'কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন' 'কারাগার সম্বন্ধে দেশের ঔদাসীন্য', প্রভৃতি শানিত জ্বালাময়ী গদ্যরচনা ছাড়া 'ঈশ্বর', 'মানুষ', 'পাপ' 'বারাঙ্গনা', কুলিমজুর' 'কৃষকের গান', 'ঝড়' 'সব্যসাচী'র মত যুগান্তসৃষ্টিকারী কবিতাসমূহ প্রকাশিত হল। দুঃস্বপ্নে চিৎকার করতে থাকল ইংরেজ সরকার। ১৯২৬ সালেই

(শেষাংশ ১০৮১ পৃষ্ঠায়)

কৃষক সম্মেলনী ও নজরুল

জিয়াদ আলী

ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক অবয়বের ভেতর সামন্তশাহী শ্রেণী-শোষণ কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব-সম্পর্ক সৃষ্টি করা সত্ত্বেও পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক চেহারা-চরিত্রে কৃষক শ্রেণীর চূড়ান্ত মুক্তির সমস্যাটি তেমনভাবে গুরুত্ব পায়নি। কৃষক শ্রেণীর ভেতর অতীতে বহুতর আন্দোলন-অভ্যুত্থানের বিস্ফার আবেগ দেখা দিয়েছিল বটে, তবে তা কৃষকের শ্রেণীগত সংগ্রামের মৌল সমস্যারূপে পরিগণিত হয়ে উঠতে পারেনি। স্রেফ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার সহজ-সরলীকৃত পন্থাটি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে কাজ করায় তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যেও শ্রেণী-চেতনা বিহীন এক ধরণের দেউলিয়া অসহায়তা পরিলক্ষিত হয়। গোটা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে এমন কি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালীন দশকটিতেও এই ভাবেই এ দেশের কৃষক সমস্যাগুলি আলোচিত হতে থাকে।

ফলে দেখা যায় খোদ ইউরোপেই যখন আইরিশদের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তখনও, এ দেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দ কখনো লর্ড উইলিংডন (১৯১৫), কখনো বা সার জেমস মেসটনের (১৯১৬) সঙ্গে আপস-সুলভ মাখামাখিতে মেতে ওঠেন। ১৯১৭-র কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনেও একই অবস্থা দেখা যায়। ১৯১৪-র মাদ্রাস অধিবেশনে লর্ড পেন্‌ট্‌ল্যান্ড কংগ্রেসকে যে অভয়বাণী দান করেছিলেন তার সংক্রমণপ্রভাবে স্বয়ং গান্ধীজী ১৯১৯-এর রাউলাট-বিরোধী আন্দোলন সাময়িকভাবে জঙ্গী চরিত্র গ্রহণ করার দিকে ঝুঁকলেও, শক্তভাবেই তার রাশ টেনে ধরেন। তাই ১৩ এপ্রিল ১৯১৯ জালিয়ানওয়ালাবাগ ইতিহাস হয়ে গেলেও এ দেশের ইতিহাসের মৌল চরিত্র বদলায় না। ১৯১৯-র শাসন-সংস্কার আইন দেশের মানুষ মেনে না নিলেও[১]. জাতীয় নেতৃবৃন্দ সেই সংস্কার-আইনের আবর্তনচক্রে মুক্তির ছিটে-ফোঁটা হদিস খুঁজতে থাকেন। এখনও দেখা যায় কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনে যোগ দিতে যাবার সময়ে শ্রীগঙ্গাধর তিলক ভারতীয় সংস্কার আইন পাস করার জন্য বৃটিশ রাজাধিরাজকে অভিনন্দনবাণী পাঠান। আর তাও-কিনা ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষে। এমন কি রবীন্দ্রনাথের 'স্যার' উপাধি ত্যাগের ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তকেও অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে সেই অধিবেশনে একটি প্রস্তাব উঠলে কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতারা সেই প্রস্তাবকে বাতিল করে দিয়ে মানবিক ন্যায়নীতির আদ্য-শ্রাদ্ধ করে বসেন।

ফলে আবহমণ্ডল বিশ্লেষণে অবস্থা যা দাঁড়ায় তা হলো "বাঙ্গালায় 'বিপ্লবান্দোলন' হইয়াছে, তাহাতে চাষীভুষি মুটে-মজুরেরা ও পতিতেরা অবজ্ঞাত ও ঘৃণ্যই হইয়াছে। বাঙ্গালায় 'দাদাবাদ' আন্দোলন হইয়াছে এবং এখনও আছে, তাহা গরীবের উত্থানের ঘোরতর বিপক্ষে। বাঙ্গালায় গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেস আন্দোলন আছে, তাহারা পতিতের কাছে যাইতে চায় বা যায়, কিন্তু তাহা কেবল বাবুদের কার্যে এই 'ছোট লোকদের' লাগাইবার জন্য, তাহা কেবল 'ছোট লোকদের' exploit করিবার জন্য এই নিপীড়িত গণশ্রেণীর লোকের কেন এই দশা প্রাপ্ত হইল, কেন পতিত হইল, ইহারা কাহারা, কি কারণে এবম্প্রকার অভিশপ্ত হইল, ইহাদের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক প্রভৃতি প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না।"[২]

এমত অবস্থার ভেতরে দাঁড়িয়েই একদা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ জানতে চেয়েছিলেন নজরুলের কাছে—সে রাজনীতিতে যোগ দেবে কি না। নজরুল বলেছিলেন 'তাই যদি না দেব তবে ফৌজে গিয়েছিলেম কিসের জন্য?'[৩] তখন, যে-মানুষ ১৯১৯-র কাল পর্যন্তও প্রবন্ধকাররূপে সাহিত্যকে পেশা হিসেবে বেছে নেবার সংগোপন বাসনা পোষণ করতেন সেই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ এবং নজরুল আরও দু-চারজনকে সঙ্গে নিয়ে পরামর্শ করতে লাগলেন কীভাবে কাজে এগুবেন তারা। সেই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবেই ১৯২০-র জুলাই মাসে নজরুল ইসলাম ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের যুগ্ম সম্পাদনায় দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নজরুল সে পত্রিকায় কৃষকদের কথা, মজুরদের কথা লিখতেন। ফলত; অবস্থা বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৯২৫ সালের ১ নভেম্বর কবি নজরুল ইসলাম, কুতবুদ্দিন আহ্‌মদ, হেমন্তকুমার সরকার ও শামসুদ্দীন হুসয়ন—এই চারজনের উদ্যোগে লেবার স্বরাজ পার্টি গঠন, নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলন (কৃষ্ণনগর, নদীয়া-১৯২৬) এবং ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজান্টস পার্টি স্থাপন, কিংবা ময়মনসিংহ জেলা কৃষক-শ্রমিক সম্মেলনে পত্র প্রেরণ ও কুষ্টিয়া কৃষক সম্মেলনে নজরুলের যোগদান প্রভৃতি ঘটনাগুলি, অথবা মাদারীপুরের ধীবর সম্মেলনে অংশ গ্রহণের উদ্দীপনা এবং কৃষক জীবন সম্পর্কিত

১ কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা : মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ পৃষ্ঠা ৭১.

২ কৃষক কে : ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

৩ কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা : মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ পৃষ্ঠা ৭০

অভিভাষণ, প্রবন্ধ, সম্পদকীয় রচনা, কবিতা ও সঙ্গীত সৃষ্টির আত্যান্তিক অনুপ্রেরণা কবির মনে সেই ১৯২০-র কালেই গভীরভাবে প্রোথিত হয়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নজরুলের বিশেষত্ব এখানেই যে সাধারণতঃ লেখক মানুষেরা তাদের বুদ্ধিজীবী সুলভ বৈশিষ্ট্যেই সক্রিয়ভাবে কৃষক শ্রমিক সংগঠন ও রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টির কাজে সাংগঠনিকভাবে সক্রিয় দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে চান না। যদিও দেশের গণ-আন্দেলন সংগ্রাম ও স্বাধীনতার যুদ্ধকে তারা নৈতিক সমর্থন ও অপ্রত্যক্ষ সহযোগিতাদানে কার্পণ্য করেন না। বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, মুকুন্দ দাস, প্রমুখের ভূমিকা সে হিসাবে সুমহান ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সুকান্ত ভট্টাচার্য বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে পার্টিজান দায়িত্ব বহন করেও সাহিত্যের স্বকীয় মূল্যকে অম্লান ভাস্করতায় ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন, তার পূর্বসূরি হিসাবে বাংলা সাহিত্যে একমাত্র নজরুলকেই দেখা যায় রাজনৈতিক সংগঠন ও গণ-আন্দোলন এবং স্বাধীনতার যুদ্ধে সক্রিয় সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে। যদিও নজরুলের সামগ্রিক জীবনের পর্যায়ক্রমগুলি-সমানভাবে সে ধারা রক্ষা করতে পারেনি, তবুও এটা সুস্পষ্ট যে সেই ১৯২১-র কালে এ দেশে যারা প্রথম কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নজরুল ছিলেন তাদের অন্যতম একজন।[৪]

সামগ্রিক বিচারে বাংলা সাহিত্যের একটা দৈন্যের দিক হল এই যে জন কর্ণফোর্ডের (স্প্যানিশ সাহিত্য ১৯৩০) মতো ত্রিশ বছরের একজন তরুণ কবি যেমন মার্কসের ক্যাপিটাল ও সেক্সপীয়রের কয়েকখানা ট্রাজেডি বাঁ কাঁধের ঝোলার মধ্যে রেখেই দু'হাতে বাইবেল নিয়ে মুক্তি যুদ্ধ করতে করতে মারা যান, কিংবা শত্রুপরিবেষ্টিত হয়ে গিয়েও মৃত্যুর ও পরাজয়ের একেবারে শেষ মুহূর্তেও মার্শাল চেন-ই (চীনা সাহিত্য ১৯৪৯-৫০) যেমন কবিতা লেখেন, কিংবা শেলীর মতো কবি (ইংরেজি সাহিত্য ১৯১০-২০) যে প্রমিথিয়ুসের কবিতা লিখতে লিখতে চার্টিস্ট মুক্তি সংগ্রামের রাজনৈতিক দলিলের খসড়া রচনা করেন, তেমনি ভূমিকা ভারতীয় সাহিত্য ক'জন লেখক পালন করতে পেরেছেন? কর্ডওয়েলের মতো একই সঙ্গে লেখক ও যোদ্ধার ভূমিকায় ক'জনকেই বা আমাদের দেশে দেখা গেছে?

এই দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে এ দেশের কৃষক আন্দোলনে নজরুলের সক্রিয় ভূমিকা পালনের ঘটনা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ঔজ্জ্বল্য সূচনা করে।

ঘটনা বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৯২৪ থেকেই নজরুল রাজনীতিক সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। মুজফ্ফর আহ্মদের লেখায় দেখা যায়, "গান্ধীজীর আগমনে যদিও নজরুল চরখার কবিতা লিখেছিল তবুও সে স্থির নিশ্চিত হয়েছিল যে চর্খা ও খদ্দরের মারফতে দেশে স্বাধীনতা কোনো দিন আসবে না। তাই তার মন জনগণের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই বিষয়টি নিয়ে সে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে, বিশেষ করে কুতুবুদ্দীন আহ্মদ, হেমন্তকুমার সরকার ও শামসুদ্দীন হুসয়নের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে। স্থির হয় যে তাদের চারজন উদ্যোক্তা হয়ে একটি দল গঠন করবেন।"[৫]

বলাবাহুল্য দি লেবার স্বরাজ পার্টি অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস নামক এই দলের প্রথম ইশ্তেহার নজরুলের দস্তখতে প্রকাশিত হয়।

"লাঙল" নাম দিয়ে এই দলের একটি সাপ্তাহিক মুখপত্রও প্রকাশ করা হয় ১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর থেকে। নজরুলের বিখ্যাত 'কৃষকের গান' কবিতাটি লাঙলের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (জানুয়ারী ১, ১৯২৬)।

আবদুল হালিমের লিখিত চিঠির উপর থেকেও এটা দেখা যায় যে, ১৯২৫ সালে নির্বাচন প্রার্থী কুতুবুদ্দীন আহ্মদের জন্য বসিরহাটের উপ-নির্বাচনী এলাকায় গিয়ে আবদুল হালিমের সঙ্গে নজরুল স্থানীয় কৃষকদের নিয়ে সভা-সমিতি করেন। ১৯২৬ সালের ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি বাংলাদেশের ময়মনসিংহ শহরে জেলা কৃষক ও শ্রমিক সম্মেলন হয়। ময়মনসিংহ সম্মেলনের জন্য কবি একটি অভিনন্দনপত্র লিখে পাঠান। হেমন্ত-কুমার সরকার সম্মেলনে সেই চিঠি পড়ে শোনান। পরবর্তীকালে 'রুদ্রমঙ্গল' গ্রন্থে চিঠিটি সংকলিত হয়। সেই চিঠিতে কবি লেখেন, এ মাঠ চাষার, এ মাটি চাষার, এর ফুল ফল কৃষক বধূর।"

১৮২৬ সালের ৬-৭ ফেব্রুয়ারি নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। নজরুল ছিলেন সেই সম্মিলনের অন্যতম উদ্যোক্তা। মুজফ্ফর আহ্মদ, আবদুল হালিম, কুতবুদ্দীন আহ্মদ, শামসুদ্দীন হুসয়ন সহ কবির স্ত্রী প্রমীলা দেবী ও শাশুড়ী গিরিবালা দেবীও সেই সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণনগর সম্মিলনেই কার্যত "লেবার স্বরাজ পার্টি অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস" নামটা বদলে বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল গঠন করা হয়। বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের নামটাই কিছুদিন পরে বদলে 'ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি' বলে নামকরণ করা হয়। নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের ইশ্তেহারটি 'লাঙল' পত্রিকায় ছেপে প্রচার করা হয়।[৬] নজরুলের 'শ্রমিকের গান' এই সম্মিলনের উদ্বোধন সঙ্গীতরূপে রচিত হয়েছিল।

এ ছাড়াও মুজফ্ফর আহ্মদের লিখিভ তথ্যাবলী থেকে জানা যায় যে তারা একই সঙ্গে ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে

৪ আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি : মুজফ্ফর আহ্মদ

৫ কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা

৬ 'লাঙল', মাঘ ১৪, ১৩৭২

কুষ্ঠিয়ায় (বর্তমান বাংলাদেশে) একটি কৃষক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। আবদুল হালিম এবং তৎকালীন গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ফিলিপ স্প্রাটও [৭] কুষ্ঠিয়ার সম্মেলনে গিয়েছিলেন। হেমন্তকুমার সরকার ছিলেন সে সম্মেলনের মূল উদ্যোক্তা। মুজাফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন "সেখানে আমরা বঙ্গীয় কৃষক লীগ—কৃষকদের একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেম। কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেসে দু-শ্রেণীর ভিত্তিতে ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজাণ্টস পার্টি গড়ার বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছিল। সেই জন্য সংগঠনকে এক শ্রেণীর ভিত্তিতে দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে ছিল আমাদের কুষ্ঠিয়ার ওই উদ্যোগ।" মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ আরও লিখেছেন, "কুষ্ঠিয়ার ওই সভাতেই আমি নজরুলের সঙ্গে রাজনীতিক মঞ্চেও শেষ দাঁড়িয়েছিলেম। ওখানকার কাজ শেষ হওয়ার পর দিনই আমরা (ফিলিপ স্প্রাট, আবদুল হালিম ও আমি) কলকাতায় চলে আসি। বাচ্চারা সুদ্ধ [৮] প্রমীলা ও গিরিবালা দেবীও আমাদের সঙ্গেই এসেছিলেন। নজরুল আরও দু-একদিনের জন্য কুষ্ঠিয়ায় থেকে গিয়েছিল।"

আনুষ্ঠানিক এই কয়েকটি কৃষক সম্মেলন ছাড়াও নজরুল যখন যে সব সভা-সমিতি উপলক্ষে যেখানেই গেছেন এলাকার কৃষক মজুর সাধারণ মানুষদের নিয়ে বৈঠকী আলাপ আলোচনায় মেতে উঠেছেন বলে জানা যায়। তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বৃত্তির স্বভাব রীতিকে অস্বীকার করে দেশের শোষিত শ্রেণীর সঙ্গে এই যে সাংগঠনিক সংযোগ তৈরির প্রচেষ্টা, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে, এর জন্যেই নজরুলের উজ্জ্বল উপস্থিতি ভিন্নতর বিস্তৃতির বিস্ফোরণ ঘটায়। তা ছাড়া কৃষক আন্দোলনের প্রচলিত রীতিনীতির সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ শোষিত কৃষকদের সংগ্রামকে শ্রেণী সংগ্রামের পর্যায়ে উত্তীর্ণ করার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা নজরুলকে যেভাবে উদ্দীপিত করেছিল কালের বিচারে তা রীতিমতো দূরদর্শিতার পরিচায়কও বটে। শ্রমিক ও কৃষকের সম্মিলিত বিপ্লব প্রচেষ্টা ছাড়া যে প্রচলিত সাম্রাজ্যব্যবস্থার আমূল কাঠামো পরিবর্তন করা যাবে না এই বস্তুবাদী অনুভব নজরুলের সাহিত্য ও সমাজ-চিন্তাকে আলোড়িত করে। সেই অমল অনুভবের স্বচ্ছতা বশেই নজরুল কৃষিভিত্তিক ভারতবর্ষের সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক জাগরণের স্বপ্নে আপ্লুত হয়ে ওঠেন। আর শুদ্ধমাত্র বিশুদ্ধ স্বপ্নভাবনা নিয়েই নজরুলের কার্যকলাপ চার-দেওয়ালের চতুষ্কোণে আবদ্ধ থাকেনি। মানসিক অনুভব ও আদর্শ চিন্তাকে তিনি সাংগঠনিক কার্যক্রমের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন—এখানেই কবি নজরুলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অনন্যতা। মহিমা-টহিমার ব্যাপার কিছু নয়। সমাজবাস্তবতা উপলব্ধি ও গণ-চেতনা প্রবাহের সঙ্গে সক্রিয় সংযোগ থাকার ফলেই নজরুলের পক্ষে এটা সম্ভব হয়।

৭ পরে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন।

৮ নজরুলের প্রথম পুত্র বুলবুল ও শিশু সব্যসাচী

(সাংবাদিকতায় নজরুল ১০৭৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

লাঙল-এর নাম বদলে 'গণবাণী' নামে প্রকাশিত হতে থাকল। এইসময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপর সমস্ত লেখা প্রকাশিত হতে থাকল। লেখা হল 'মন্দির ও মসজিদ' 'কাণ্ডারী হুশিয়ার'। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে নজরুল যেমন নিরপেক্ষ সত্যদৃষ্টি পোষণ করেছেন তৎকালে অন্য কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে তা একান্তই বিরল। তখন নজরুলকে আক্রমণ করার লোকেরও অভাব ছিল না! 'লাঙলের গান' প্রকাশিত হবার পর 'তারারা' ছদ্মনামে 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ করা হল। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত তার জবাব দেন নজরুলকে সমর্থন করে। 'লাঙল' ও গণবাণীর পর্বে, নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি শ্রমিক কৃষকের আন্দোলন ও তার প্রচারে বিশেষভাবে উজ্জ্বল। কিছু উদাহরণ রাখা যেতে পারে যেমনঃ 'কপট সাধু সন্ন্যাসী ও মোল্লা-মৌলবী প্রভৃতির দুষ্ট আওতা হতে ভারতের কৃষক ও শ্রমিক জীবনকে সম্পূর্ণ মুক্ত না করতে পারলে আমাদের উদ্ধারের আশা একেবারেই নাই। 'সমাজের পরান্নভোজী ধনিকগণই শ্রেণী সংগ্রামের জন্য দায়ী, তারা উৎপাদনকারীদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে বলেই শ্রেণী সংগ্রামের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রমিকদের ভিতরে বিদ্রোহ মাথা তুলে উঠেছে। আজকের দিনে বাজে ঐক্যের দোহাই দেওয়া আর চলবে না। শ্রমিকদের জাগরণ অবশ্য অ-শ্রমিক লোকেরা খুব ভাল চোখে দেখে না, যেহেতু এতে তাদের স্বার্থের হানি যথেষ্ট হবে।' ইত্যাদি অসংখ্য বক্তব্য তুলে কবির শ্রমিক কৃষকের প্রতি স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করা সম্ভব।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কবি ছিলেন উৎসর্গীকৃত প্রাণ ও শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামী নেতা। এই কারনেই কবি নজরুল শুধুমাত্র কাব্যরচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারেননি। সাংবাদিকতার দুরূহ দায়িত্ব তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। সাংবাদিক নজরুলের কর্মকাণ্ড সে-সময়কার গণজাগরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল; মানুষের বুকে আগুন ধরিয়েছিল। নজরুলের কবিতার পাশাপাশি নজরুলের সাংবাদিকতা। সাংবাদিক নজরুলের বিরাট ও মহান ভূমিকাকে বাদ দিয়ে কবির কাব্য প্রতিভার মূল্যায়ন সম্ভব নয়। অল্পদিনের কর্মিষ্ঠ জীবনের মধ্যে এমন বিপুল বিভিন্ন গোত্রের সৃষ্টিকাণ্ড সম্ভব হয়েছিল কবির রাজনৈতিক ও দার্শনিক বিশ্বাসের গভীরতার কারণেই।

মানুষের চেতনাকে জাগ্রত ও সমৃদ্ধ করে তুলতে সুকান্ত-চর্চার ব্যাপক অনুশীলন প্রয়োজন : মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা-ভাবনা ও মানবতাবিরোধী অবক্ষয়ী দর্শনের বিরুদ্ধে সুকান্ত একদিন চ্যালেঞ্জস্বরূপ দাঁড়িয়েছিল, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মাথা নত না-করবার সংকল্পে নিজে অটল থেকে কিশোর ও সুকান্ত বিপর্যস্ত সমাজব্যবস্থায় ছিল সুকান্ত বিপর্যস্ত সমাজব্যবস্থায় ছিল স্পর্ধিত ব্যতিক্রম। আজ আমরা যেন তার যোগ্য উত্তরপুরুষ হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করতে পারি। কথায় ও কর্মে মানুষের সঙ্গে সত্য আত্মীয়তা অর্জন করতে পেরেছিল সুকান্ত, আমরা যেন পূর্বসূরির সে পথ অনুসরণ করে আত্মীয়তাকে আরও নিবিড় করতে পারি।

২৭ এপ্রিল ১৯৭৮ পৌরসংস্থার উদ্যোগে বেলেঘাটার সি. আই. টি রোড ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোডের সংযোগস্থলে প্রয়াত কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের মর্মর মূর্তি স্থাপন উপলক্ষে এক জনসভায় মূর্তিটির আবরণ উন্মোচন করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

পৌর কর্তৃপক্ষকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে শ্রীবসু আরও বলেন, জনগণের প্রাণের কবি সুকান্তের মর্মর মূর্তি স্থাপন অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু স্বার্থবুদ্ধি ও সংকীর্ণতা আমাদের একাংশকে এমনই পর্যুদস্ত করে তুলেছে যে এ কাজে অগ্রসর হবার মানসিকতা তারা হারিয়ে ফেলেছে। যাইহোক দেরিতে হলেও যে একাজ সম্পূর্ণ হল এজন্য আমরা ধন্য।

কবিকে স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কবি সুকান্ত যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সারির কতিপয় কবির মধ্যে একজন—এ সত্যকে স্বীকার করে নিতে বহু সময় লেগেছে। কিন্তু সত্যকে তো বেশিদিন ঢেকে রাখা যায় না,—তাই আজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুকান্ত গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে, দ্বিধা থাকলেও না মেনে তাদের আর কোনো উপায় নেই। রবীন্দ্র-উত্তরকালে সুকান্ত যে সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি এ সত্য কে অস্বীকার করবে?

খেটে-খাওয়া মানুষের প্রতি নিবেদিত-প্রাণ কবি সুকান্তের জীবনচর্যা আলোচনা করে শ্রীবসু বলেন, সুকান্ত কবি, সমাজসেবী, বিপ্লবী, আর সবার ওপরে একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট। শোষিত লাঞ্ছিত মানুষের রাজত্ব কায়েম করবার অনুপ্রেরণায় সে একদিকে যেমন বিপ্লবী কবিতা লিখেছে, তেমনি তাদের মধ্যে একাত্ম হয়ে মিছিলে মিছিলে সত্য আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। সাংস্কৃতিক জগতের একজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও শ্রমজীবী মানুষের শরিক হয়ে উঠেছিল আক্ষরিক অর্থেই। কর্মে ও কথায় কোনো বিরোধ ছিল না বলেই মধ্যবিত্তসুলভ কোনো অবসাদ তাকে গ্রাস করে নি, মৃত্যুদিন পর্যন্ত তিনি বিশ্বাস হারান নি, আদর্শে অবিচল ছিলেন।

সুকান্তের দৃপ্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য স্মরণ করে শ্রীবসু বলেন, সুকান্ত নিপীড়িত মানুষকে উদ্দীপিত করবার জন্যই তার বলিষ্ঠ লেখনীকে পরিচালিত করেছিল। শিল্পীর অপমৃত্যুতে সে চেতনাকে জাগ্রত ও সমৃদ্ধ করে তুলতে সুকান্ত-চর্চার ব্যাপক অনুশীলন প্রয়োজন। আজকে দৃঢ়ভাবে আমাদের ঘোষণা করতে হবে যে, আমরা যারা তার আদর্শে বিশ্বাস করি তার অপূর্ণ কাজকে সফল করবার জন্য আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। আজকের যুবশক্তি যত গভীরভাবে সুকান্ত-সাহিত্য পড়বে, ততই অবক্ষয়ী সংস্কৃতির হাত থেকে তারা মুক্ত হতে পারবে। সারা দেশ জুড়ে অপসংস্কৃতির একটা স্রোত বইয়ে দেবার চক্রান্ত চলছে। আমাদের সরকার সীমিত সামর্থ্য নিয়েও শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতকে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা চাই এরাজ্যে সুস্থ ও রুচিসম্পন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠুক। আমরা মনে করি, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে হলে বিকল্প প্রগতিশীল ও সুস্থ সংস্কৃতি হাজির করতে হবে মানুষের সামনে। সুকান্ত ছিলেন প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে উজ্জ্বলতম প্রতিবাদ,—আমরা যদি সেই ঐতিহ্যের সুমহান পতাকা বয়ে নিয়ে যেতে পারি তবেই তাকে যোগ্যতম সম্মান জানানো হবে।

প্রধান অতিথির ভাষণে পৌরমন্ত্রী শ্রীপ্রশান্ত শূর বলেন, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীর সঙ্গে সঙ্গে আজ পৌরবিভাগও এই মূর্তি স্থাপন করতে পেরে গৌরববোধ করছে। এই মূর্তি স্থাপনের পেছনে কিছু বেদনাও রয়ে গিয়েছে। ১৯৭০-৭১ সালে যুক্তফ্রন্টের আমলেই সুকান্তের মূর্তি প্রতিষ্ঠার সব পরিকল্পনা আমরা করেছিলাম। অর্থও মঞ্জুর করা হয়েছিল। কিন্তু পূর্বতন কংগ্রেস সরকার পরিচালিত পৌর কর্তৃপক্ষ সে সিদ্ধান্ত ইচ্ছাকৃতভাবে এতদিন কার্যকর করেনি। শুধু তাই নয় ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের পরে যখন আবার এর উদ্যোগ নেবার কথা হল, তখন দেখা গেল কোনো নথিপত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জাগ্রত জনমানসের বলিষ্ঠ কবি সুকান্তের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠায় তারা স্বভাবতই আগ্রহী থাকতে পারে না। যাইহোক শ্রীপ্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সক্রিয় আগ্রহে ও সকলের সহযোগিতায় নাগরিকদের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত এই কাজ আজ সম্পন্ন হল। অপশাসন, অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে আজ আমরা একটি বলিষ্ঠ চিন্তাকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হলাম।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশূর জানান, তারা যখন কাউন্সিলার ছিলেন তখন কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ কবি সুকান্তের নামে একটি রাস্তা ও একটি মর্মর মূর্তির কথা বারবার বলেছিলেন। রাস্তার নামকরণে কংগ্রেসী কর্তৃপক্ষ বারবার বিরোধিতা করেছিলেন। আজ বেলেঘাটার চড়কডাঙার নাম হয়েছে কবি সুকান্ত সরণি। দুটি আশা পূর্ণ করতে পেরে আমরা স্বস্তি অনুভব করছি।

সভাপতি শ্রীবারীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, কবি সুকান্ত ছিল একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট,—আমি তাকে খুব কাছ থেকে দীর্ঘদিন দেখেছি। তার আত্মত্যাগ, নিষ্ঠা ও কর্মোদ্যোগ যদি যুবশক্তি অনুসরণ করত তবে আমরা আজ আমাদের দেশের অন্য চেহারা দেখতাম। পার্টির প্রতি তার ভালবাসা ও যুক্তিনির্ভর আনুগত্য ভোলা যায় না। তিনি একজন বিপ্লবী কবি ছিলেন বলেই কালের প্রয়োজনে মানুষের সপক্ষে একলা চলার নীতি পরিত্যাগ করে মিছিলের সঙ্গে চলতেই ভালবাসতেন।

(শেষাংশ ১০৮৪ পৃষ্ঠায়)

গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রামের মানুষের মনে স্বস্তি এনেছে

গাঁয়ের গরিব মানুষগুলো একটু যেন স্বস্তির মুখ দেখছে। সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি তাদের জীবনে এসে গেছে এমন কথা নিশ্চয়ই কেউ বলেনা। কিন্তু তবু কোথায় যেন তাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। যাদের গ্রমের সংগে সামান্যতম যোগাযোগ রয়েছে, তারা হয়তো এই পরিবর্তনটুকু লক্ষ্য ক'রে থাকবেন।

হুগলী জেলার পোলবা থানার মুড়িগড় গাঁয়ের আদিবাসী মেয়ে রমণী হেমব্রমের ভাষাতেই এই পরিবর্তনের ইংগিত সুস্পষ্ট। রাস্তার কাজ করতে করতে রমণী বলেছিল, 'মিথ্যা বলব না বাবু, এই বছরটি ভালই কাটল বটে।'

'কেন ভাল কাটল?'

কপালে চোখ তুলে একটু অসহিষ্ণু মেজাজে সে বলেছিল, 'ভাল কাটবেক নাই? অসময়ে কাজ পেইছি, কাজ করেছি, পয়সা বুঝে লিয়েছি। একেই তো ভাল কাটা বলে।'

জিজ্ঞাসাবাদ করতে জানা গেল যে গাঁয়ের গরিব মানুষ বলতে যাদের বোঝায়, সেইসব ক্ষেতমজুর ও ভূমিহীন চাষীরা গত আমন রোপণের মরশুম থেকে বেকার থাকেনি বললেই চলে। গত অক্টোবর-নভেম্বর মাসে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে তারা কাজ করেছিল। এখন তারা গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে কাজ পেয়েছে।

হুগলী জেলায় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের কাজ এখন পুরোদমে চলছে। মোট ১৭টি ব্লকের সব কয়টিতে এই প্রকল্প চালু। মোট ১৩৫টি স্কিম সমগ্র জেলায় গ্রহণ করা হয়েছে। এর জন্য খরচের অংক ধরা হয়েছে ৫৯ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। এই টাকার সবটাই পাবে গরিব মানুষেরা—গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজ ক'রে। একজন মজুর রোজ পাচ্ছে নগদে ১ টাকা ৯০ পয়সা এবং ২ কিলোগ্রাম গম। টাকার অংকে সর্বসাকুল্যে প্রতিদিনের আয় ৪ টাকা। মজুরি বিচারে দৈনিক ৪ টাকা নিঃসন্দেহে কম। কিন্তু অসময়ে এর মূল্য দারুন। অতীতে গ্রামের উন্নয়নকল্পে এমন ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ ক'রে পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলের গরিবদের মুখে হাসি ফোটাবার আর দ্বিতীয় নজির বোধকরি সৃষ্টি করা হয়নি। পোলবা ব্লকের বরুণাপাড়ার রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছিল। ২ মাইল লম্বা রাস্তা। মাটি ফেলে রাস্তা উচুঁ ও চওড়া করা হচ্ছে। প্রায় দু'শ নারী-পুরুষ এই রাস্তার কাজে নিযুক্ত।

তিলকা মুর্মুর কাহিনী একটু করুণ। ঘরে তার দু'টি নাবালক সন্তান। গত সনে গাঁয়ের জোতদারের কাছে দু'শ টাকা কর্জ করেছিল। সে টাকা শোধ হয়নি। এবার স্বামী স্ত্রী মিলে রোজ ৮ টাকা পাচ্ছে। এই টাকা থেকে কিছু কর্জ শোধ দেবে।

পোলবা ব্লকে ১৩টি স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে। এর জন্যে ব্যয় হবে ৪ লাখ ২১ হাজার টাকা। এই ব্লকে একটি খাল খনন করা হচ্ছে। খালটির নাম বগার খাল। যেখানে খাল কাটা হচ্ছে, তার আশপাশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল নাব্যতার দরুন জলে ডুবে যায়। দীর্ঘ খাল কেটে জল নিকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে এক বিস্তীর্ণ এলাকায় ফসলের উজ্জ্বল সম্ভাবনা আশা করা হচ্ছে।

ধনিয়াখালি ব্লকের ভান্ডারহাটি গ্রাম থেকে যাদববাটি পর্যন্ত ৪ মাইল লম্বা একটা রাস্তা হচ্ছে। রাস্তাটি, ধনিয়াখালি বি, ডি, ওর ভাষায়, 'একটি লিংক রোড'। আশেপাশের ৩০টি গ্রামের সংগে যোগাযোগ করার একমাত্র প্রধান রাস্তা হোল এটি।

শেরপুর প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক হারাধন ঘোষ বললেন, 'মশাই এটা নামেই রাস্তা ছিল। আসলে রাস্তার কোন অস্তিত্ব ছিল না। আমার ৩৮ বছর বয়সে রাস্তাটির এই প্রথম মেরামতির কাজ দেখছি।'

ধনিয়াখালি ব্লকে ৫টি স্কিম রূপায়িত হবে। এর আনুমানিক ব্যয় ৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার ছাড়াও আর একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি হোল সেচনালা খনন। স্থানীয় লোকের পরিভাষায় সেচনালাকে বলা হয় গৈ। এই গৈ প্রসঙ্গে বি, ডি, ওর কাছে জানা গেল, কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে ধনিয়াখালি ব্লকে ছোটবড় প্রায় ৫০টি গৈ (সেচনালা) খনন করা হয়। এক একটা গৈ ৪।৫ কিলোমিটার লম্বা, ২।৩ মিটার চওড়া। ধনিয়াখালি সেচ-সেবিত এলাকা নয়। কাণানদীর জল এইসব গৈ দিয়ে প্রবাহিত ক'রে প্রায় ৫০০০ বিঘা জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হবে। এই ব্লকের মামুদপুর গ্রামে আর একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি রূপায়ণে ৭ হাজা'

(শেষাংশ ১০৮৪ পৃষ্ঠায়)



রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের দীর্ঘ দিনের দাবি স্বীকৃত

কর্মচারীদের একমাত্র প্রতিনিধিত্ব মূলক সংগঠন রাজ্য-কো-অর্ডিনেশন কমিটি দীর্ঘদিন ধরেই মূল কর্মস্থল প্রশাসন কেন্দ্র রাইটার্সে একটি অফিস ঘর চেয়ে এসেছে। সম্প্রতি বামফ্রন্ট সরকার তাদের এই ন্যায্য দাবি স্বীকার করে নিয়ে রাইটার্সে "এফ" ব্লকের পাশে একতলায় একটি ঘর দিয়েছেন। ঘরটি আনুষ্ঠানিক ভাবে সংগঠনকে অর্পণ করেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু। পূর্ত বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী এই ঘরটি দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানে রাজ্য-কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক, শ্রীঅজয় মুখার্জী তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের একটি ন্যায্য দাবি মেনে নেবার জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে অভিনন্দন জানান। তারপর পূর্তমন্ত্রী একটি ছোট ভাষণে কর্মচারীদের অফিসে উপস্থিতির বিষয়টির প্রতি বিশেষ নজর দিতে বলেন। মুখ্যমন্ত্রী সরকারী কাজকর্মে সংগঠনগুলির সক্রিয় ভূমিকা প্রতিপালনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন যে কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পূরণের জন্য বর্তমান সরকার সাধ্যমত চেষ্টা করছেন। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের পরে মুখ্যমন্ত্রী ও পূর্তমন্ত্রী পুল-কার ড্রাইভারদের বিশ্রাম কক্ষ উদ্বোধন করেন। ড্রাইভারদের এতদিন পর্যন্ত গাড়ি রাখবার পর বসবার কিংবা অপেক্ষা করবার স্থান ছিল না। এই সর্বপ্রথম রাইটার্সের পশ্চিমদিকে যেখানে পুল-কার গ্যারেজটি আছে সেখানে এই নতুন বিশ্রাম কক্ষটির ব্যবস্থা করে দীর্ঘদিনের একটি মানবিক দাবি এই সরকার পূরণ করলেন।



গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প স্বস্তি এনেছে

(১০৮৩ পৃষ্ঠার পর)

শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়। মামুদপুরে ১ হাজার ফুট গভীর ও ১০ হাজার ফুট লম্বা একটি জলাধার মাটি কেটে নির্মাণ করা হয়েছে। এই জলাধারের জল ১৫০০ বিঘা জমিতে জলসেচ করবে।

গ্রামের প্রায় সর্বত্র কাজ হচ্ছে। যারাই কাজ করতে ইচ্ছুক, তারাই কাজ পাচ্ছে। এক একটি স্কিমে শ'য়ে শ'য়ে লোক কাজ করছে।

আরামবাগ ব্লকে রাস্তা সংস্কারের জন্য প্রায় ২ লাখ ৪৯ হাজার টাকার ব্যয় ধরা হয়েছে। গোঘাট ব্লকে ৩ লাখ ৮৪ হাজার টাকা, খানাকুল ১ নং ও ২ নং ব্লকে প্রায় ৬ লক্ষাধিক টাকা, চণ্ডীতলা ১ নং ব্লকে ২ লাখ ৪৫ হাজার টাকা, পাণ্ডুয়া ব্লকে ৩ লাখ ৪ হাজার টাকা ও মগড়া ব্লকে ২ লাখ ৩ হাজার টাকা ব্যয় হবে।

গ্রামের মানুষ সোৎসাহে কাজ করছে। নিজ নিজ এলাকার উন্নতির জন্যে কে কতটা বেশি শ্রম দিতে পারে, তার জন্যে এলাকাভিত্তিক মানুষগুলো যেন মেতে উঠেছে।

হুগলি জেলাশাসকের মতে, গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের রূপায়ণের দ্বারা গ্রামগুলির স্থায়ী কিছু সমস্যার সমাধান হবে। তিনি জানালেন, গ্রামের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্যে হুগলি জেলায় ১৯৭৭-৭৮ সালে ৬৫টি নতুন নলকূপ ও ২৪৪টি পুরনো নলকূপ পুনর্বার খনন ক'রে চালু করা হয়েছে। এ ছাড়াও প্রতি ব্লকে ১০টি ক'রে নতুন নলকূপ শীঘ্রই বসাবার ব্যবস্থা করা হবে। গ্রামের গৃহহীন পরিবারদের বসতবাটি নির্মাণ সুরু হয়েছে। যারা দরিদ্র এবং গৃহহীন আপাতত ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় ৩ শতাধিক বাড়ি তৈরী ক'রে তাদের দেওয়া হবে।

সুকান্ত-চর্চার অনুশীলন প্রয়োজন

(১০৮২ পৃষ্ঠার পর)

বিধানসভার অধ্যক্ষ মনসুর হবিবুল্লাহ্ স্মৃতিচারণ করে বলেন, সুকান্ত যেদিন কিশোর-সভার পাতাটির ভার নিল, সেদিন সমস্ত কিশোররা এক নতুন পরিবর্তনে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিল। আজ আবার সেইরকম কিছু দরকার আমাদের কিশোরদের সামনে।

কমিশনার শ্রীজে. কে. কোহ্‌লী, পৌর-সচিব অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও বক্তব্য রাখেন।

বহু সংস্থা, বিদ্যালয়, কলেজ ও ব্যক্তির তরফ থেকে মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। উদ্বোধন সংগীত পরিবেশণ করেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মধ্য কলিকাতা শাখা। সভার শেষে কবির কবিতা-আবৃত্তি, রানার নৃত্যনাট্য, নাটক, ছৌ-নৃত্য প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথ্য ও জনসংযোগ কর্তৃক প্রকাশিত ও স্বদেশী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড, ৫৮ এ ও বি লোয়ার রেঞ্জ কলিকাতা-৭০০০১৯ থেকে মুদ্রিত।

অন্যেরা কী বলছেন

রাজ্যের কতিপয় রাজনৈতিক নেতা সব সময়েই এবং সর্বক্ষেত্রেই বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের খুঁত ধরার জন্য সচেষ্ট। এঁদের ইতিপূর্বে বক্তব্য ছিলঃ রাজ্য সরকার রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দানের দাবি জানাচ্ছে, অথচ এই সরকার নাকি নিচের স্তরে ক্ষমতা ও দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক আগামী ৪ঠা জুন পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত উক্ত রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্যের অসারতা সুপ্রমাণিত করেছে।

ক্ষমতা ও দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণের প্রকৃত অর্থ আমাদের বুঝতে হবে। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেট ভাষণে বলেছিলেন ঃ আমরা যখন ক্ষমতা ও দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলি তখন শুধু কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে প্রশাসনিক কাজকর্ম ও রাজস্ব ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের কথা বলতে চাই না। আমরা সমভাবেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে, রাজ্যের সদর দপ্তর থেকে ক্ষমতা জেলায় জেলায় জেলা থেকে ব্লকে ব্লকে এবং পঞ্চায়েতগুলিতে সঞ্চালিত হবে। গ্রামবাসীরা যদি গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নমূলক কাজের অংশীদার হিসাবে নিজেদের ভাবেন তাহলেই গ্রামীণ প্রকল্প অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। সেই হেতু আমরা সর্বনিম্নস্তরের পঞ্চায়েতগুলিকে নিজ নিজ পরিকল্প রূপায়ণ করার দায়িত্ব নিজেদের হাতে গ্রহণে উৎসাহ দেব।

প্রসংগত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত সংগঠনগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারপর থেকে আজ পর্যন্ত পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নি। বামপন্থীফ্রন্ট সরকারই নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং নির্বাচনী প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ। পঞ্চায়েত সংগঠনগুলির পূর্ণ পুনর্গঠনের জন্য অপেক্ষা না করে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার এই সংগঠনগুলিতে নিয়োজিত নিম্ন বেতনের বে-সরকারী চৌকিদার ও দফাদারদের মাসিক বেতন বাড়িয়ে দিয়েছে। উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত সংস্থাগুলিতে নিয়োজিত চৌকিদার ও দফাদারদের সংখ্যা ২৫,০০০।

পঞ্চায়েত সংগঠনসমূহের কি কাজ হবে? এসম্পর্কে রাজ্য সরকারের বক্তব্য হলঃ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর অঞ্চল স্তরের পঞ্চায়েতগুলিকে নিজ নিজ পরিকল্প রচনা করতে এবং পরিকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব নিজেদের হাতে গ্রহণ করতে উৎসাহ দেওয়া হবে। এই স্তরের প্রতিটি পঞ্চায়েত আটদশটি গ্রামের অধিবাসীর প্রতিনিধিত্ব করবে এবং গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মকান্ডে সরাসরি লিপ্ত হবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা সমূহের কোনগুলি অগ্রাধিকার পাবে সে-সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার পঞ্চায়েত সমূহের হাতে থাকবে। এ সম্পর্কে অর্থ সরবরাহকারী সংস্থাগুলি হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। যে সব পরিকল্পনা রূপায়ণ করলে যুগপৎ গ্রামীণ সম্পদ ও কর্মসংস্থান বাড়তে পারে তাদের মধ্য থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা পঞ্চায়েতগুলির থাকবে। এই সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে থাকবে ঃ সেচের নালা, জলনিকাশী নালা, পুকুর পুনঃসংস্কার, পানীয় জলের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা ইত্যাদি।

এটা যে গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

গণশক্তি। ২২ মে ১৯৭৮

গ্রামাঞ্চলের কায়েমী স্বার্থ অসাধু আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতায় বেশ করে খাচ্ছিল। বহুকাল পঞ্চায়েতের নির্বাচন বন্ধ। ১৯৭৩-এ নতুন পঞ্চায়েত আইন পাশ হয়েও নির্বাচনের ব্যবস্থা হল না। আজ বামফ্রন্ট সরকার সেই কংগ্রেসের তৈরি আইনের ভিত্তিতেই নির্বাচনের অনুষ্ঠান করতে চলেছেন।

নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন বাদে পঞ্চায়েতের যে নির্বাচন হচ্ছে তার তাৎপর্য বিপ্লবাত্মক। কেন না, এই নির্বাচনের ফলে গ্রামের স্বয়ংশাসিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থার হাতে আসবে প্রচুর ক্ষমতা। যে ক্ষমতার সুষ্ঠু ব্যবহারের ফলে গ্রামের চেহারার অমূল পরিবর্তন ঘটবে। আর এর ফলে জমিদার-জোতদাররা কোণঠাসা হয়ে পড়বে।

...মজার কথা লোকসভা-বিধানসভা নির্বাচনে গ্রামের লোকই ভোট দিয়েছে রাজনীতির বিচারে। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজনীতির ভিত্তিতে নির্বাচন হবে না কোন্ যুক্তিতে?

সত্যযুগ। ১৮. ৫. ৭৮

পশ্চিমবঙ্গে যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন হতে যাচ্ছে সেটি একটি বিরাট পরীক্ষা। স্বায়ত্তশাসনের সবচেয়ে নিচের ধাপে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠার যে নির্দেশ আমাদের সংবিধানে রয়েছে সেই নির্দেশ ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে কার্যকর করা হলেও পশ্চিমবঙ্গে একটা সার্থক পঞ্চায়েতী শাসন গড়ে তোলার জন্য এতদিন পর্যন্ত বলতে গেলে প্রায় কিছুই করা হয় নি। গত ১৫ বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের নির্বাচন হয় নি। ইতিমধ্যে বারবার পঞ্চায়েত আইনের সংশোধন হয়েছে এবং যতবার সরকার বদল হয়েছে ততবারই পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নির্বাচন হয় নি। এখন যেহেতু কেন্দ্রে নতুন একটি সরকার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও গ্রামের উন্নয়নের উপর নতুন গুরুত্ব আরোপ করতে চাইছেন এবং যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের সরকার কেন্দ্র থেকে স্থানীয় স্তর পর্যন্ত ক্ষমতার ভাগ সম্পর্কে নতুন করে প্রশ্ন তুলছেন সেহেতু পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পর্কে প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।

পঞ্চায়েতীরাজ সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান অশোক মেহতা সম্প্রতি যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পঞ্চায়েতী সংস্থাগুলির সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নেওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করছেন; কিন্তু এব্যাপারে অনেক সমস্যা রয়েছে।

আসল কথাটা সম্ভবত এই যে, রাজনৈতিক দলগুলি পঞ্চায়েতগুলিকে বিধানসভা ও লোকসভার ভবিষ্যৎ নির্বাচনে ভোট সংগ্রহের যন্ত্র হিসাবে দেখছে। এমনকি, প্রফুল্ল সেন ও তাঁর যেসব সহযোগী "দলহীন গণতন্ত্রের" কথা বলছেন তাঁদেরও ভিতরকার কথা সম্ভবত এটাই। আর এই কারণেই অন্তত পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে দলহীন পঞ্চায়েত নির্বাচনের বুলিটা এমন ফাঁকা ঠেকছে। দলীয় আনুগত্যের উপর আমরা এমনই জোর দিচ্ছি যে, বিধানসভায় বা সংসদে দলের বিরুদ্ধে ভোট দিলেই সংশ্লিষ্ট সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করে দেওয়ার জন্য আমরা আইন আনতে চাইছি। অথচ যে পঞ্চায়েতগুলিকে আমরা অন্তত মুখে গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমি হিসাবে গড়ে তোলার কথা বলছি সেখানে দলীয় আনুগত্যের কোন দাম থাকবে না তা কেমন করে হয়?

যুগান্তর। ২২. ৫. ৭৮



রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ ও রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত প্রদর্শনীর একাংশ। এই প্রদর্শনীতে মানবিকতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনার অংশবিশেষ, কবির নিজের আঁকা ছবি, কিছু দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র ও ব্যবহৃত জিনিসপত্র প্রভৃতি স্থান পায়।



পঁচিশে বৈশাখ ১৩৮৫ সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে এক অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত রবীন্দ্রগবেষক শ্রীনেপাল মজুমদারকে তাঁর 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' নামের গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রপুরস্কার প্রদান করছেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষ।